বেলায়তে মোতলাকা

একটি বিশ্লেষণ

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট

بسم الله الرحمن الرحيم

বেলায়তে মোতলাকা

একটি বিশ্লেষণ

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট

(SZHM Trust)

বেলায়তে মোতলাকা

একটি বিশ্লেষণ

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট

(SZHM Trust)

প্রথম প্রকাশ:
কার্তিক ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
নভেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

দ্বিতীয় প্রকাশ:
শ্রাবণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
আগস্ট ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

প্রকাশনায়:
শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট
(SZHM Trust)
গাউসিয়া হক মন্‌জিল, দরবার-ই গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

গ্রন্থস্বত্ব:
SZHM TRUST

মুদ্রণে:
আলোকধারা বুকস্’
ডিউ উদয়ন’ (লেভেল-১২),
বাস টার্মিনাল সংযোগ সড়ক
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।

মূল্য: ৩০০ টাকা মাত্র

পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ-

“বেলায়তে মোত্‌লাকার স্বরূপ উন্মোচক,
হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)’র মনোনীত অছি হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)
এবং
প্রেমপন্থী মযলুম সুফি-সাধকবৃন্দ”

بسم الله الرحمن الرحيم

মুখবন্ধ

মহান রাব্বুল আলামিনের অশেষ কৃপায় বাংলাদেশের মাইজভাণ্ডার শরিফ বর্তমানে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী সুপরিচিত তাসাওউফ কেন্দ্র। বিশ্ববিখ্যাত তাসাওউফ ব্যক্তিত্ব গাউসুল আযম মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) হলেন জগৎ বিখ্যাত এই তাসাওউফ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর আবির্ভাবের পর থেকে এলাকার নামানুসারে তাঁর প্রবর্তিত তাসাওউফ ধারা 'মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা' নামে পরিচিতি অর্জন করে। তিনি এই তাসাওউফ ভিত্তিক কর্ম তৎপরতাকে ছড়িয়ে দেওয়ার তাগিদে যুগশ্রেষ্ঠ অসংখ্য আউলিয়া সৃষ্টি করেছিলেন। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কর্তৃক তাওহিদ প্রচারের অনুশীলিত কর্মপন্থা এবং প্রচার নীতি মূলত তাঁর খলিফাদের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করে। তবে সময়ের ব্যবধান এবং যুগ চাহিদার আলোকে এই তাসাওউফ ধারা সম্পর্কে কিতাব ভিত্তিক আলোচনা উপস্থাপন জরুরী হওয়ায় গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর অছি খাদেমুল ফোক্বারা হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীয়া (ক.) ত্বরিকার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াবলি নিয়ে বেলায়তে মোত্লাকা নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। বেলায়তে মোত্লাকা প্রকৃত অর্থে শুধুমাত্র পরম শ্রদ্ধেয় লেখকের নিজস্ব অভিমত ভিত্তিক তাসাওউফ গ্রন্থ নয়। বরং গ্রন্থটি তাসাওউফ জগতের পৃথিবী খ্যাত অনেক আউলিয়া-দার্শনিকের চিন্তা-চেতনা কর্মনীতি এবং লেখনীর বিষয় ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা হিসেবে

বিবেচনাযোগ্য। সম্মানিত লেখক বেলায়তে মোত্‌লাকা গ্রন্থের “গ্রন্থকারের দুটি কথা” মুখবন্ধে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন– “অত্র গ্রন্থে যে সমস্ত কেতাব বা বিবৃতির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছি উহার কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন না করিয়া মূল এবারত এবং ইহার অর্থ অবিকৃত রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছি। আমি হেকায়তকারী (বর্ণনাকারী) মাত্র”। সহজ কথায় বেলায়তে মোত্‌লাকা গ্রন্থটি বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাস এবং বিশ্ব তাসাওউফ দর্শনের আলোকে যুগোপযোগী কর্মপন্থার সন্নিবেশনে আবির্ভূত মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার মর্মানুধাবনের স্বপক্ষে সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা। পরম শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার পূর্ববর্তী নবি-রাসুল আকাবেরের পথ ও কর্মপন্থা বর্ণনা সাপেক্ষে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার দার্শনিক সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

বেলায়তে মোত্‌লাকা বাংলা ভাষায় রচিত অতি উচ্চাঙ্গের তাসাওউফ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ সম্পর্কে ইমাম শেরে বাংলা মাওলানা সৈয়দ আজিজুল হক আল কাদেরী (র.) বলেন, ‘আমি আশা করি এই কিতাবটি উচ্চ শ্রেণির ত্বরিকত পন্থির জন্য বিশেষ উপকারে আসবে’। মমতাজুল মোহাদ্দেসিন মৌলানা ওবাইদুল আকবর (র.) বলেন, ‘বাংলা ভাষায় সুফিবাদ সম্বন্ধে এই ধরনের গভীর আলোচনা সম্বলিত গ্রন্থ আর চোখে পড়ে নাই’। বিশ্ব তাসাওউফ দর্শনের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব বেলায়তে মোত্‌লাকা গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে বিভিন্ন স্থানে আলোচিত হওয়ার কারণে উক্ত বিষয়গুলো বিশ্ব তাসাওউফ সম্পর্কে অনীহ পাঠকের নিকট অনেকটা দুর্বোধ্য হিসেবে ঠেকে। উপরন্তু বেলায়তে মোত্‌লাকার সম্মানিত গ্রন্থকার হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর মনোনীত অছি এবং আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী হওয়ার কারণে এ গ্রন্থে কশ্‌ফ, ইলহাম, বিজদান, ফিরাসাত তথা অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ জ্ঞানের সমাবেশ ঘটেছে। তাই গ্রন্থে উল্লেখিত বিশেষ কিছু তত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অত্যাবশ্যক বিবেচনায় রেখে বেলায়তে মোত্‌লাকা একটি বিশ্লেষণ মূলক এই পুস্তকটি প্রকাশ করা হলো। বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাসাওউফের অনেক মূল্যবান কিতাবের রেফারেন্স যুক্ত করা হয়েছে। রেফারেন্সসমূহের সত্যতা নিশ্চিতের জন্য পুস্তিকার শেষ অংশে মূল কিতাবের স্ক্যান কপিও সংযুক্ত করা হয়েছে।

তাসাওউফ ধারা সম্পর্কে অবহিত ব্যক্তি মাত্রই ‘ওয়াহ্‌দাতুল অজুদ’ এবং ‘ওয়াহদাতুশ্‌ শহুদ’ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকেন। ওয়াহ্‌দাতুল অজুদের মৌলিক ভিত্তি হচ্ছে, ১. “তাঁর আসন, তাঁর কর্তৃত্ব পৃথিবী ও নভোমণ্ডলের সর্বত্র বিস্তৃত। আর তা সংরক্ষণে তিনি অক্লান্ত। তিনি সর্বোচ্চ, সুমহান (সূরা বাক্বারাঃ আয়াতাংশ, ২৫৫)”; ২. “মহাবিশ্বে যেখানে যা কিছু আছে সবই নশ্বর। অবিনশ্বর শুধু আপনার প্রতিপালকের সত্তা। যিনি মহা-মহিম, মহানুভব (সূরা আর রহমান : ২৬−২৭)”। তাই তাসাওউফ ধারার প্রথম দিক থেকেই অলি-দরবেশের জীবন পদ্ধতিতে উপর্যুক্ত কুরআনিক নির্দেশনার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়েছে। ওয়াহ্‌দাতুল অজুদ পন্থার সাধক-দরবেশ সম্পর্কে কোন কোন ফকিহ্‌র পক্ষ থেকে ভিন্ন অভিমত প্রকাশ করা হলেও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তাসাওউফ ধারার আলোকে প্রাথমিক সময়ে ওয়াহ্‌দাতুল অজুদের প্রকাশ্য বিরোধিতা কেউ করেননি। তবে ওয়াহ্‌দাতুল অজুদ চেতনার বিস্ময়কর বিষ্ফোরণ হিসেবে “আনাল হক” উচ্চারণ করায় ইতিহাস খ্যাত মহান সুফি ব্যক্তিত্ব আল্লাহ্‌র প্রেম মত্ততার তুফান এবং আগুন খেতাবে সম্বোধিত মনসুর হাল্লাজ শূলে আরোহণ অবস্থায় বিভিন্ন কায়দায় দৈহিক নির্যাতনের মাধ্যমে শহিদী সুধা পান করার পরেও প্রতিটি রক্ত ফোঁটা এবং পরবর্তীতে পবিত্র দেহভষ্ম থেকে সমুদ্রের পানি পর্যন্ত সর্বগ্রাসী রূপ নিয়ে উত্তাল-উন্মাদ হয়ে আনাল হক গর্জন করতে করতে প্রমাণ করে দিয়েছেন ওয়াহ্‌দাতুল অজুদের তাৎপর্য। অথচ হযরত বায়েজীদ বোস্তামী [হযরত ইমাম জাফর সাদেক (র.)’র শিষ্য] ইতোপূর্বে স্বীয় ‘হামা উস্ত’-এর প্রকাশ ঘটিয়ে এক পর্যায়ে ‘সোবহানী’ অর্থাৎ ‘মহিমা আমারই’ ব্যক্ত করে ওয়াহ্‌দাতুল অজুদ ধারাকে প্রাণবন্ত রেখেছিলেন। একই ধারায় ওমর ইবনুল ফারেদ (পবিত্র মিশর নগরী নিবাসী সাধক) বলেছিলেন− ‘আনা হিয়া’ অর্থাৎ ‘আমিই সে’। ওয়াহ্‌দাতুল অজুদ ধারায় আরও অন্যান্য সুফি সাধক হলেন আল্লামা জালালুদ্দিন রুমি, আবদুল করিম জিলি, আবদুল গনি নাবলুসী, শেখ আবু সাঈদ আবুল খায়ের (র.)’র মতো আরও অসংখ্য জগত-বিখ্যাত সুফি দার্শনিক। সুপ্রসিদ্ধ কাদেরিয়া ত্বরিকার জিকির ‘লা মওজুদা ইল্লাল্লাহ্‌’ ওয়াহ্‌দাতুল অজুদের সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ। মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা এবং এতদ-সম্পর্কিত গ্রন্থ বেলায়তে মোত্‌লাকা সম্পর্কে ধারণা প্রাপ্তির লক্ষ্যে ওয়াহ্‌দাতুল অজুদ বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি জ্ঞাত থাকা অত্যাবশ্যক। কেননা বেলায়তে মোত্‌লাকা

গ্রন্থটি ওয়াহ্দাতুল অজুদ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই প্রণীত। ফলে এই গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়গুলো ওয়াহদাতুশ্ শহুদের দৃষ্টিকোণে বিচার করা সমীচীন হবে না।

ওয়াহ্দাতুল অজুদ সম্পর্কে সহজ ধারণা প্রাপ্তির লক্ষ্যে বেলায়ত প্রাপ্ত আউলিয়ায়ে কেরামের প্রদর্শিত কারামত-এর সূত্র সম্পর্কে ধারণা থাকা বাঞ্চনীয়। কারামত শব্দের সরল অর্থ হচ্ছে অসাধারণ শক্তি। সুফি পরিভাষায় বলা হয় ঐশী শক্তি। এই শক্তি আল্লাহ্-প্রেমে মত্ত আউলিয়াকে বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হয়। মা'রিফাতের নিগূঢ় পরিভাষায় বলা হয়, 'কুওয়াতুল বুন'– অর্থাৎ 'কুন্' উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কাঙ্খিত বিষয় হয়ে যাওয়া। এটি প্রকৃত অর্থে স্রষ্টার নিজস্ব ব্যাপার। সাধক-দরবেশ যখন ফানাফিল্লাহ্ জগৎ অতিক্রম করে তখন বাকাবিল্লাহ্তে স্থিত হয়ে প্রশান্ত রূপে অবস্থান নেন এবং আল্লাহ্ তাঁকে আধ্যাত্মিক রাজত্ব তথা বেলায়ত প্রদান করেন। এই রাজত্ব পরিচালনার জন্য 'কুন্' শক্তি প্রদান করা হয়। আউলিয়ায়ে কেরামের কারামত 'কুন্' শক্তির বহিঃপ্রকাশ। কারামত প্রদর্শনকালে আউলিয়ায়ে কেরামের নিজস্ব হাস্তি থাকে না। খোদ্ এলাহী তখন বিরাজমান থাকেন। কারামত উৎস এবং প্রকাশ ভঙ্গিমার মধ্যেই রয়েছে ওয়াহ্দাতুল অজুদ ধারার অন্যতম ভিত্তি।

ইসলাম ধর্মে শুরু থেকেই তাসাওউফ সাধনায় ওয়াহ্দাতুল অজুদ ধারা বিদ্যমান ছিল। এই ধারা কখনো আল্লাহ্ এবং সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কিত ধারণার মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করেনি। এ বিষয়টি মহানবি (দ.)'র সঙ্গে একবার উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)'র কথোপকথন এবং পবিত্র কুরআন সম্পর্কে বেলায়তের সম্রাট হযরত আলী (রা.)'র অভিব্যক্তি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া সংসার বিরাগী সর্বসুখত্যাগী আসহাবে সুফ্ফার জীবনাতিপাতও ওয়াহ্দাতুল অজুদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

তাসাওউফ ধারায় ওয়াহদাতুশ্ শহুদের প্রথম প্রকাশ ঘটে হযরত খাজা রোকনুদ্দীন (র.)'র মাধ্যমে ভারত বর্ষে। ওয়াহদাতুশ্ শহুদ-যার অর্থ আল্লাহ্ এবং বিশ্ব জগৎ দুটি পৃথক সত্তা-তথা স্রষ্টা থেকে সৃষ্টি আলাদা মর্ম ব্যক্ত করে তারই সংক্ষিপ্ত অর্থবোধক পরিচিতি। তাসাওউফ ধারায় ওয়াহদাতুশ্ শহুদের বিশেষভাবে প্রকাশ ঘটে হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্শবন্দী (র.)'র মাধ্যমে। পরবর্তী সময়ে হযরত শেখ আহমদ সেরহিন্দি (র.) ওয়াহ্দাতুল অজুদ ধারার

ভীষণ সমালোচনা করে শহুদীয়া ধারার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করেন। এ ধারায় তাঁর অভিব্যক্তি হচ্ছে আল্লাহ্‌কে লাভ করার পন্থা কেবল ইশ্‌ক নয়, দাসত্বও একটি প্রকৃষ্ট পন্থা। আল্লাহ্‌র নৈকট্যের শেষ মকাম দাসত্ব। স্রষ্টা মূল এবং বিশ্বজগৎ তাঁর প্রতিবিম্ব। প্রতিবিম্ব কখনো মূল হতে পারে না। শহুদীয়া ধারা প্রচারের পর মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে প্রখ্যাত মজযুব দরবেশ হযরত শাহ্‌ সরমদ (রহ.) দিল্লীর শাহী মসজিদের বারান্দায় শিরশ্ছেদের মাধ্যমে শাহাদত বরণ করেন। এ সময় তাঁর বিচ্ছিন্ন শির 'ইল্লাল্লাহ্‌' জিকির সমগ্র এলাকা মুখরিত করে তোলে। এ সময় আল্লাহ্‌ তাঁর অসীম কুদরতি অজুদ এভাবে ব্যক্ত করে স্বীয় অস্তিত্বের চিরন্তন অবস্থিতি জ্ঞাত করেছেন।

হযরত শেখ আহমদ সেরহিন্দি (র.)'র সময় থেকে তাসাওউফ জগতে অজুদিয়া (সর্বত্র একমাত্র আল্লাহ্‌র একক সত্তাই বিদ্যমান) এবং শহুদিয়া নামে দুটি দলের সৃষ্টি হয়। তাসাওউফ জগতে শহুদিয়া ধারা নিঃসন্দেহে একটি অনুসৃত পন্থা। তবে সকল সৃষ্টির মিলনাকাঙ্ক্ষা যে স্রষ্টা কেন্দ্রিক এবং এর জন্যে প্রয়োজন আমিত্ব তথা পৃথক সহানুভূতির সবকিছু বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের স্বার্থে হযরত ইসমাইল (আ.), হযরত আব্দুল্লাহ্‌ (রা.), হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)'র মতো আত্মোৎসর্গের অসীম সাহসিকতার অনুশীলন। এখানে স্রষ্টা-সৃষ্টির সম্পর্ক বন্দেগী ধারা অতিক্রম করে প্রেমিক প্রেমাস্পদ ধারায় অভিন্ন ও একাকার হয়ে যায়। প্রেমিকের নিকট তখন প্রেমাস্পদ ব্যতীত অন্যকিছু দৃশ্যমান এবং অনুভূতিপ্রবণ হয় না। সুলতানুল হিন্দ খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (ক.)'র মতানুসারে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালায় মৃত কুকুরের দেহ পচে গলে যখন বালুচরে স্থিত হয় এবং বালিতে মিশে যায়, বালি থেকে যখন লবণ উৎপাদিত হয় তখন লবণ দৃশ্যমান ও ভোগ্যপণ্য হলেও কুকুরের অবশেষ আর মোটেও অবশিষ্ট থাকে না। তাসাওউফ ধারায় ওয়াহ্‌দাতুল অজুদ বলতে আল্লাহ্‌র মধ্যে এভাবে সম্পূর্ণ অন্তর্লীন হয়ে অবস্থান গ্রহণকে বুঝায়।

ওয়াহ্‌দাতুল অজুদ বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক বিতর্ক সৃষ্টির পূর্বে বিশ্বখ্যাত আউলিয়া দার্শনিক, বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (ক.)'র রূহানি সন্তান হযরত মুহিউদ্দীন ইবনু আরাবী (রা.) এ মতাদর্শ সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক ধারণা পেশ করেন। তাঁর মতে সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে স্রষ্টা ব্যতীত দ্বিতীয় কিছুর অস্তিত্ব

তথা অজুদ নেই। অনেক ফকিহের নানা রকম আক্রোশ এবং তিরস্কারের মুখেও তিনি ওয়াহ্‌দাতুল অজুদের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে ওয়াহ্‌দাতুল আদ্‌ইয়ান সম্পর্কে ধারণা পেশ করেন। তাঁর এই মতবাদ সকল প্রকার বিভেদ-বিতর্কের উর্ধ্বে উঠে ঘোষণা দেয় সমস্ত মযহাব ও শরিয়তের মূল হাকিকত এক। এটি অবিকল সেই মতবাদ, যা মনসুর হাল্লাজ পোষণ করতেন। প্রত্যেক মযহাব এবং শরিয়তের চরম লক্ষ্য যখন আল্লাহ্‌ পাকেরই সত্তা, তখন সমস্ত শরিয়তের ও মযহাবের হাকিকতও একই হবে। বেলায়তে মোতলাকা সম্পর্কে ধারণা প্রাপ্তির জন্য উপর্যুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়ে থাকে।

ভারত উপমহাদেশে আলেম-ওলামাদের অজুদিয়া, শহুদীয়া দ্বন্দ্ব-বিরোধ প্রবল আকার ধারণ করলে হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ্‌ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত ‘ফয়সালায়ে ওয়াহ্‌দাতুল অজুদ ওয়াশ্‌ শহুদ’ গ্রন্থে অত্যন্ত সহজ-সরল ব্যাখ্যা দিয়ে বিরোধ অবসান কল্পে উল্লেখ করেছিলেন– মত এবং পথের বিভিন্নতা অত্যন্ত স্বাভাবিক, তবে মূল উদ্দেশ্য-লক্ষ্য এবং কেন্দ্রস্থল এক ও অভিন্ন। সুতরাং এ বিষয়ে বিতর্ক অবান্তর।

বেলায়তে মোত্‌লাকা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জনের লক্ষ্যে পবিত্র কুরআনের সূরা কাহাফ-এর ৬০ থেকে ৮২ নং পর্যন্ত আয়াতের মর্মার্থ অনুধাবন করা জরুরী। আল্লাহ্‌র প্রিয় নবি হযরত মুসা (আ.) এবং দরবেশের সঙ্গে সংঘটিত ঘটনাপঞ্জি ও কথোপকথনের শেষ আয়াতে উল্লেখ আছে– “তুমি (মুসা) যে বিষয়ে ধৈর্য রাখতে পারোনি এই হচ্ছে তার তাৎপর্য। আমি নিজে থেকে কিছুই করিনি”। মহান আল্লাহ্‌র অসীম জ্ঞান ভাণ্ডার সম্পর্কে উপর্যুক্ত নির্দেশনার আলোকে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা এবং এতদ সংক্রান্ত গ্রন্থ বেলায়তে মোতলাকা বিষয়ে অনুসন্ধান প্রবণতার প্রয়োজন আছে। তাই পাঠক সমীপে আমাদের আবেদন, বেলায়তে মোত্‌লাকা সম্পর্কে ধারণা প্রাপ্তির লক্ষ্যে নির্মোহ, নৈর্ব্যক্তিক মানসিকতা নিয়ে প্রকৃত গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা-পর্যালোচনা করলে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মধ্যেই গ্রন্থের সার তত্ত্ব প্রকাশ পাবে।

এক্ষেত্রে নির্মোহ, নৈর্ব্যক্তিক, মানসিকতার সমুজ্জল উদাহরণ হিসেবে হযরত শেখ আহমদ সেরহিন্দি (র.)’র ‘মকতুবাত’ গ্রন্থের ২৬৬তম মকতুবে শায়খ

মুহিউদ্দিন ইবনু আরাবী (র.) সম্পর্কে তাঁর আকিদা প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, **"শায়খ মুহিউদ্দিনের প্রতি ইহা আমার খাছ আকিদা ও বিশ্বাস যে, তাঁহাকে আল্লাহ্ তায়ালার মকবুল বলিয়া জানি অথচ তাঁহার বিপরীত এলমসমূহকে ভুল ও সাধারণের ক্ষতিকারক বলিয়া দেখিতেছি। ছূফীগণের কোন কোন সম্প্রদায় শায়খের প্রতি নিন্দা অপবাদ করেন ও তাঁহার এলমসমূহকেও ভুল বলিয়া ধারণা করে এবং অন্য দল শায়খের অনুসরণ করেন এবং তাঁহার এলমসমূহকে সত্য বলিয়া জানেন। বরং দলিলাদি দ্বারা তাঁহার সত্যতা প্রমাণ করে, কিন্তু ইহাতে সন্দেহ নাই যে, এই উভয় দল মধ্য অবস্থা হইতে সরিয়া অতিরিক্ততা করিয়াছে। শায়খ আল্লাহ্ তায়ালার মকবুলগণের অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং কাশ্‌ফের ভুল বশতঃ তাঁহাকে কিভাবে 'রদ' করা যাইতে পারে, এবং তাঁহার এলমসমূহ যাহা সত্য হইতে বহুদূরে অবস্থিত ও সত্যবাদী আলেমগণের মতের বিপরীত– কিভাবে তাহা গ্রহণ করতঃ উহার অনুসরণ করা যাইতে পারে? অতএব এই উভয়ের মধ্যাবস্থাই সত্য, যাহা আল্লাহ্ তায়ালা স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে উপলব্ধি করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। অবশ্য "ওয়াহ্দাতুল ওজুদ" বা একবাদের মাছআলার মধ্যে শায়খের সহিত ছুফীগণের এক বিরাট দল একমত, যদিও শায়খ এই মাছআলায় একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন; কিন্তু মূল বাক্যে সকলেই সমতুল্য। এই মাছআলাটি বাহ্যতঃ যদিও সত্যবাদী আলেমগণের বিশ্বাসের বিপরীত, তথাপি উহা চিন্তা সাপেক্ষ ও সমাধানযোগ্য।" [দ্রঃ স্ক্যান-১]**

এখানে একাডেমিক কোন বক্তব্য বা রচনাকে একজন স্কলার কীভাবে নির্মোহ, নৈর্ব্যক্তিক মানসিকতায় মূল্যায়ন করবে তার উজ্জলতম একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন হযরত শেখ আহমদ সেরহিন্দি (র.)। তিনি যেহেতু ওয়াহদাতুশ্ শহুদ মতাদর্শের স্কলার সেহেতু শায়খ মুহিউদ্দিন ইবনু আরাবী (র.)'র ওয়াহ্দাতুল অজুদ বিষয়ক বক্তব্যগুলো তাঁর নিকট অসঙ্গত মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এই অসঙ্গত মনে হওয়া থেকে তিনি শায়খ মুহিউদ্দিন ইবনু আরাবী (র.)-কে একেবারে বাতিল সাব্যস্ত করেননি। বরং মতাদর্শের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও তিনি ইবনু আরাবীকে আল্লাহ্‌র মকবুল বান্দার অন্তর্ভুক্ত হিসেবে মনে করতেন। উপরন্তু সুফিদের বিরাট একটি দল যে, তাঁর এই মতাদর্শের সাথে একমত তা

নির্মোহভাবে তুলে ধরতে কোনরূপ কার্পণ্য করেননি। অথচ ইসলামের জীবনবোধ, দর্শন এবং আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে সীমিত ধারণায় আচ্ছন্ন অনেক ব্যক্তি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে শায়খ মুহিউদ্দিন ইবনু আরাবীর প্রতি কুফরির এলজাম দিতেও দ্বিধা করেন না। এখানেই মূলত একজন কশ্‌ফধারী ব্যক্তি এবং কশ্‌ফহীন ব্যক্তির মূল্যায়নের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে পড়ে।

বেলায়তে মোত্‌লাকা সম্পর্কে নানামুখী আলোচনা, পর্যালোচনা, ক্ষেত্রবিশেষে সমালোচনা ও বিভিন্ন মতামতের কারণে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু বিশ্লেষণের চেষ্টা হিসেবে এই পুস্তক রচনা করা হয়েছে। এতে হয়তো মতভিন্নতা থাকা অস্বাভাবিক নয়। তবে গবেষণা এবং সত্য তথ্য উদঘাটন ও অনুধাবনের পথে সসীমের এই প্রচেষ্টা নতুন দিগন্তের সৃষ্টি করতে পারে।

আউলিয়ায়ে কেরামের মুখনিঃসৃত জযবায়ী কালাম

[বেলায়তে মোত্লাকাঃ পৃষ্ঠা– ১০৫, তৃতীয় প্রকাশের পুনঃপ্রকাশ]

আল্লাহ্র আউলিয়ায়ে কেরাম ফানা ফিল্লাহ্-বাকা বিল্লাহ্র স্তরে গিয়ে খোদার প্রেমে বিভোর-মগ্ন অবস্থায় অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের জযবায়ী-রহস্যময় কালাম-উক্তি করেন। এই উক্তিগুলো গভীর তাৎপর্যপূর্ণ কিন্তু আক্ষরিক অর্থের মানদণ্ডে উক্তিগুলোর মর্মার্থ খুঁজে নেওয়া অসম্ভব। শুধুমাত্র সাহেবে কশ্ফ ব্যক্তি সত্তাগণই এর যথাযথ ব্যাখ্যা উপলব্ধি করতে পারেন। যুগে যুগে অসংখ্য সুফিয়ায়ে কেরাম এ ধরনের গভীর রহস্যপূর্ণ উক্তি করেছেন এবং তাঁদের উক্তিগুলো তাসাওউফের দীর্ঘ ইতিহাস পেরিয়ে এখনো স্ব স্ব অবস্থানে মহীয়ান হয়ে আছে। হযরত মনসুর হাল্লাজের "আনাল হক" উক্তিটি সর্বজনজ্ঞাত এবং তাসাওউফের ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ।

এরকম রহস্যময় উক্তি শুধুমাত্র হযরত মনসুর হাল্লাজ নয়, আরো অসংখ্য আউলিয়ায়ে কেরামের পবিত্র জবান থেকে প্রকাশিত হয়ে এসেছে যুগ-যুগ ধরে।

গাউসুল আযম হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (ক.)'র জযবায়ী কালামঃ

গাউসুল আযম হযরত শায়খ মুহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী (ক.) জযবায়ী হালতে বিভিন্ন সময় অসংখ্য রহস্যময় কালাম ব্যক্ত করেছেন। তিনি তাঁর কসিদায় বলেন– وَاَمْرِىْ اَمْرُ اللهِ اِنْ قُلْتُ كُنْ يَكُنْ

অর্থঃ আমার আদেশ আল্লাহ্‌রই আদেশ, আমি যখন হও (কুন্) বলি তখন হয়ে যায় (ইয়াকুন)।
[সূত্র– সুফি সৈয়দ নাসির উদ্দিন হাশেমী রযবী বরকতী কৃত 'মাযহারে জামালে মোস্তফায়ী' গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১১৬, দ্রঃ স্ক্যান কপি-২]

তাসাওউফের সুপ্রসিদ্ধ কিতাব ইনসানে কামেলের 'নবুয়ত ও বেলায়ত' পরিচ্ছেদে উল্লেখ আছে–
شیخ عبد القادر کا قول فتوحات مکیہ میں محی الدین ابن عربی نے باسناد خود بیان کیاھے کہ وہ فرماتے ھیں کہ اے انبیاء کے گروہ تم کو تو نبوت کالقب ملا اور ھم نے وہ چیز پائی جو تم کو نہیں ملی

অর্থঃ শায়খ মুহিউদ্দিন ইবনু আরাবী 'ফতুহাতে মক্কিয়া'য় শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী (রা.)'র বাণী সনদ সহকারে বর্ণনা করেন, তিনি (শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী) বলেন– "হে নবিগণ, তোমাদের তো নবুয়তের লকব মিলেছে। আর আমি ঐ বস্তু পেয়েছি, যা তোমাদেরও মিলেনি।"
[সূত্রঃ ইনসালে কামেল, নবুয়ত ও বেলায়ত পরিচ্ছেদ, দ্রঃ স্ক্যান কপি-৩]

হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.)'র জযবায়ী কালামঃ
হযরত শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র.) রচিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'তাযকেরাতুল আউলিয়া'য় বর্ণিত হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.)'র জীবনীতে তাঁর কতিপয় জযবায়ী রহস্যপূর্ণ উক্তি উল্লেখ আছে। যেমন–
ক.

لوائی اعظم من لواء محمد

অর্থঃ আমার পতাকা মোহাম্মদ (রাসুলুল্লাহ্ দ.)'র পতাকার চেয়ে 'আযম' তথা সুউচ্চ।
[সূত্রঃ তাযকেরাতুল আউলিয়া (ফার্সি), পৃষ্ঠাঃ ১৬৪, দ্রঃ স্ক্যান কপি-৪]
খ.

سبحانی ما اعظم شانی

অর্থঃ আমি মহান, আমার শান কত বড়!
[সূত্রঃ তাযকেরাতুল আউলিয়া (ফার্সি), পৃষ্ঠাঃ ১৩৪, দ্রঃ স্ক্যান কপি-৫]

গ.

بایزید را گفتند فردای قیامت خلایق در تحت لوای محمد علیه الصلوة والسلام باشند گفت بخدائی خدای که لوای من از لوای محمد زیادت است که پیغامبران وخلایق در تحت لوای من باشند

অর্থ: হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রা.)-কে বলা হলো, 'কিয়ামতের দিন সমগ্র সৃষ্টি রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র পতাকার নিচে থাকবে'। অতঃপর তিনি (বায়েজিদ) শপথ করে বলেন, 'আমার পতাকার নিচে সমগ্র সৃষ্টির সাথে সাথে নবিগণও থাকবেন'। [সূত্রঃ তাযকেরাতুল আউলিয়া (ফার্সি), পৃষ্ঠা: ১৬৩, দ্রঃ স্ক্যান কপি-৬]

ঘ.

از وی سؤال کرد که عرش چیست گفت منم وگفت کرسی چیست گفت منم وگفت لوح و قلم چیست گفت منم گفتند خدایرا بندگانند بدل ابراہیم و موسی وعیسی صلوات اللہ علیہم اجمعین گفت آن ہمہ منم گفتند میگویند

অর্থ: হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল– আর্‌শ কী? তিনি বলেন, আর্‌শ আমি নিজেই। পুনরায় কুরসি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, কুরসিও খোদ্ আমিই। লওহ্-কলম সম্পর্কেও তিনি একই কথা বলেন। এরপর প্রশ্নকারী বলেন, আল্লাহ্ তায়ালার তো আরও অনেক নৈকট্যধন্য বান্দা আছেন। যেমন– হযরত ইবরাহিম, হযরত মুসা, হযরত ঈসা আলাইহিমুস্ সালাম আজমাঈন। এখানেও তিনি বলেন, তাঁরাও আমিই।
[সূত্রঃ তাযকেরাতুল আউলিয়া (ফার্সি), পৃষ্ঠা: ১৬০, দ্রঃ স্ক্যান কপি-৭]

বাহরুল উলুম খ্যাত হযরত মাওলানা সৈয়দ আবুল বারাকাত মোহাম্মদ আব্দুল গনি কাঞ্চনপুরী (র.) রচিত 'আয়নায়ে বারী' গ্রন্থে উল্লেখ আছে–

کوئی بزرگ کسی سالک سے کہا کہ حضرت بایزید سے صحبت رکھا کیجیو اس نے جواب دیا کہ میں صحبت خدا سے رکھتا ہوں وہ مرد بزرگ بولا کہ بایزید کی صحبت خدا کی صحبت سے بہتر ہے

অর্থ: কোন এক বুজুর্গ ব্যক্তি কোন এক সালেক তথা খোদা পথচারীকে বলেন, হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.)'র সোহবত তথা সংস্পর্শে থাকিও। তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি খোদার সোহবতেই রয়েছি'। ঐ মর্দে বুজুর্গ বলেন, 'বায়েজিদের সোহবত খোদার সোহবতের চেয়েও বেহতর'।
[সূত্র: আয়নায়ে বারী, পৃষ্ঠা: ৩৮০, দ্র: স্ক্যান কপি-৮]

একইভাবে বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহমদী যুগের ইমাম গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)-কেও অনেক সময় মগ্‌লুবুল হাল তথা ভাবতন্ময় অবস্থায় বিভিন্ন ধরনের রহস্যপূর্ণ উক্তি বা বাণী করতে দেখা গিয়েছে। যেমন তিনি বলেন– "আমি হাসরের দিন প্রথম বলিব লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"। ধুরঙ্গ খালের গতি পরিবর্তনের ব্যাপারে তিনি বলেছিলেন– "রসুলুল্লাহ্‌র সহিত বেয়াদবী করায় তাড়াইয়া দিয়াছি", আবার সৈয়দ মোহাম্মদ হাশেম সাহেবকে বলেছিলেন– "রসুলুল্লাহ্‌র নাতীদ্বয় হাসনাইনের সহিত আদব কর।" বেলায়তে মোত্‌লাকা গ্রন্থেই এই বাণীগুলোর ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, "ইত্যাদি বাণীতে তাঁহার জিল্লে মোহাম্মদী বা প্রতিচ্ছবি হইবার প্রমাণ মিলে।" অর্থাৎ ফা'না ফির রাসুলের চূড়ান্ত একটি স্তরে গিয়ে হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) এরূপ বাণীগুলো করেছেন। যেমনিভাবে হুজুর গাউসে পাক শায়খ সৈয়দ আব্দুল কাদির জিলানী (ক.)ও ফানা ফির রাসুলের চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে বলেছিলেন– هذا وجود جدی محمد صلی الله علیه وسلم لا وجود عبد القادر

অর্থ: "(আমার) এই অস্তিত্ব (আমি) আব্দুল কাদেরের নয়, (আমার) নানা রাসুল (দ.) এর।"

হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র আরও একটি রহস্যময় কালাম হলো– "ইয়ে আমকা দরখ্‌ত নেহি হ্যায়! বাবা আদম হ্যায়। বহুত দিন তক্ মুন্তজির খাড়া হ্যায়। ইছওয়াস্তে উচকা চুতড় পর দু কতরা পানি দিয়া।" এ ধরনের বাণীও হুজুর গাউসে পাক শায়খ সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (ক.) করেছেন। যেমন–

ولی نشأة فی الحب من قبل ادم ★ وسری سری فی الکون من قبل نشأتی

অর্থ: আমার ভালোবাসার প্রারম্ভ হয়েছে আদম (আ.)'রও আগে এবং আমার রহস্য জগতে ছড়িয়ে পড়েছে আমার আগমনেরও আগে।
[সূত্র– সুফি সৈয়দ নাসির উদ্দিন হাশেমী রযবী বরকতী কৃত 'মাযহারে জামালে মোস্তফায়ী' গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১২১, দ্রঃ স্ক্যান কপি-৯]

وَكُنْتُ مَعَ اِبْرَاهِيْمَ مُلْقًى بِنَارِهِ * وَمَا بُرِّدَ النِّيْرَانَ اِلَّابِدَعْوَتِىْ

অর্থ: ইবরাহিম যখন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হন তখন আমি তাঁর সাথে ছিলাম আর আমার দোয়া ব্যতীত অগ্নিকুণ্ড শীতল হয়নি।
[সূত্র– সুফি সৈয়দ নাসির উদ্দিন হাশেমী রযবী বরকতী কৃত 'মাযহারে জামালে মোস্তফায়ী' গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১২৩, দ্রঃ স্ক্যান কপি-১০]

আপাত দৃষ্টিতে এই রহস্যপূর্ণ বাণীগুলোর মর্মার্থ বোঝা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু এই বাণীগুলো যেহেতু আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের অতি প্রিয় এবং অতি উচ্চস্তরের অলি-আল্লাহ্গণ থেকে প্রকাশ পেয়েছে সেহেতু এই বাণীগুলোর মর্মার্থ সাধারণ জ্ঞানে বুঝে না আসলেও সেগুলো অলি-আল্লাহ্র রহস্যপূর্ণ উক্তি বিধায় নেতিবাচক মন্তব্য থেকে বিরত থাকতে হবে।

সুফিয়ায়ে কেরামের কিছু রহস্যমূলক কর্ম যা শরিয়তের বাহ্যিক দৃষ্টিতে আপত্তিকর

[বেলায়তে মোত্লাকা: পৃষ্ঠা- ১০৬, তৃতীয় প্রকাশের পুনঃপ্রকাশ]

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا অর্থ: "যে বিষয় আপনার জ্ঞানায়ত্তে নেই সে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করবেন কীভাবে?" [সূরা কাহাফ: ৬৮]। হযরত খিজির (আ.) হযরত মুসা (আ.)-কে এই উক্তি করেছিলেন। এই উক্তিটি করার একটি প্রেক্ষাপট রয়েছে। অর্থাৎ যখন হযরত মুসা (আ.) আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে হযরত খিজির (আ.)'র নিকট আধ্যাত্মিক জ্ঞান শিক্ষা লাভের জন্য উপস্থিত হন এবং তাঁর সঙ্গে নিজেকে রাখার জন্য অনুরোধ করেন তখন হযরত খিজির (আ.) এই উক্তিটি করেছিলেন। এরপর সকল বিষয়ে ধৈর্যধারণ করা, আদেশ মেনে চলা এবং কোন বিষয়ে প্রশ্ন না করার শর্তসাপেক্ষে হযরত খিজির (আ.) হযরত মুসা (আ.)-কে সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করেন। কিন্তু যখন হযরত খিজির (আ.) একটার পর একটা রহস্যপূর্ণ ঘটনার অবতারণা করতে লাগলেন তখন সেগুলো হযরত মুসা (আ.)'র জ্ঞান-বিবেচনা এবং শরিয়তের দৃষ্টিকোণে চরম আপত্তিকর বলে মনে হচ্ছিল। তাই তিনি গৃহীত শর্তের কথা বিস্মৃত হয়ে বার বার প্রশ্ন করতে লাগলেন। সর্বশেষ ঘটনা সংঘঠিত হওয়ার পর হযরত খিজির (আ.) হযরত মুসা (আ.)-কে বলেন,

الَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِىْ وَبَيْنِكَ سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَالَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا

অর্থ: "এখানে আপনার ও আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হলো। যে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেননি আমি তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি" [সূরা কাহাফ: ৭৮]।

এরপর হযরত খিজির (আ.) যখন সংঘঠিত ঘটনাগুলোর রহস্য প্রকাশ করলেন তখন হযরত মুসা (আ.)'র যাবতীয় সন্দেহ-সংশয় দূরীভূত হয়ে যায় এবং বুঝতে পারেন যে, এই কাজগুলো অন্যায় কিংবা আপত্তিকর ছিলই না, বরং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের ইচ্ছাসঙ্গত এবং অতি কল্যাণকর ছিল। এই সম্পূর্ণ ঘটনা আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন। এখন প্রশ্ন হলো– এই ঘটনাটি তিনি কুরআনে এত গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেছেন কেন? তিনি তো পবিত্র কুরআনে অনর্থক কিছু বর্ণনা করেননি এবং পবিত্র কুরআনেই বারংবার উল্লেখ করা আছে, কুরআনে বর্ণিত ঘটনাপঞ্জি বান্দা শিক্ষা-নিদর্শন হিসেবে গ্রহণ করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং বুঝে নিতে হবে নিশ্চয়ই এই ঘটনা বর্ণনার পেছনেও সুনির্দিষ্ট কোন হেকমত লুক্কায়িত রয়েছে। হযরত খিজির (আ.)'র এই ঘটনাটি মূলত তাঁর বেলায়তপূর্ণ একটি অবস্থার বর্ণনা। সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে শুরু করে যুগ যুগ ধরে বেলায়তের অধিকারী নবি-রাসুল এবং আল্লাহ্র আউলিয়ায়ে কেরামের ধারা পৃথিবীতে প্রবাহিত হয়ে এসেছে এবং আখেরী নবি হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.)'র আগমনের পর হতে শুধুমাত্র আল্লাহ্র আউলিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে বেলায়তের ধারা প্রবাহিত হয়ে আসছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বহমান থাকবে। এই সকল আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন অলি-আল্লাহ্ থেকে খিজির (আ.)'র মতো অনেক সময় বিভিন্ন ঘটনা প্রকাশ পাবে, যা পার্থিব বিবেচনা কিংবা শরিয়তের বাহ্যিক দৃষ্টিকোণে আপত্তিকর বলে মনে হবে। যেভাবে হযরত মুসা (আ.)'র নিকট মনে হয়েছে। কিন্তু যখন এই ঘটনাগুলোর হাকিকত ও রহস্য প্রকাশিত হবে তখনই কেবল বোধগম্য হবে এইগুলো শরিয়তের হাকিকত দৃষ্টিভঙ্গি এবং মাকাসিদুশ শরিয়ার সাথে কত গভীর সম্পর্কযুক্ত। তাই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন উম্মতে মোহাম্মদীকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে হযরত খিজির (আ.)'র এই ঘটনাটি পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন। যাতে কোন বেলায়তের উঁচু মকামে আসীন আল্লাহ্র অলি থেকে এই ধরনের ঘটনা প্রকাশ পেলে তখন আমরা ধৈর্যধারণ করি এবং রহস্য অনুধাবন করতে না

পারা পর্যন্ত বিরূপ মন্তব্য থেকে বিরত থাকি। এতদ-সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা নিম্নে তুলে ধরা হলো–

রোযা অবস্থায় পানাহার করানো প্রসঙ্গ:

فأمر الشيخ خادمه أن يمد السماط، فلما هيـأه وأخذوا في الأكل قال لخادمه : اقعد وكل، قال: أنا صائم، قال: كل ولك أجر صوم يوم، قال: أنا صائم، قال: كل ولك أجر صـوم أسبوع، قال: أنا صائم، قال: كل ولك أجر صوم شهر، قال: أنا صائم، قال: كل ولك أجر صوم سنة، قال: أنا صائم، قال: كل ولك أجر صوم الدهر، قال: أنا صائم. فنظر إليه مغضبا فسقط إلى الأرض وانتفخ جسده وتقطر قيحا ودما، فشفع فيه المشايخ الحا□رون وسكنوا غضبه عليه □تى ر□ي عنه، فعاد كما كان كأن لم يكن به شيء

অনুবাদ: একদিন গাউসুল আযম হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী (ক.) খাদেমকে বললেন, "বসো ও খাও"। খাদেম বললো, "আমি রোযাদার"। তিনি বললেন, "তুমি খাও, তুমি একদিনের রোযার সাওয়াব পেয়ে যাবে"। সে পুনরায় বললো, "আমি রোযাদার"। তিনি বললেন, "খাও, তুমি এক সপ্তাহের রোযার সাওয়াব পেয়ে যাবে"। সে পুনরায় বললো, "আমি রোযাদার"। তিনি বললেন, "খাও, তুমি এক মাসকাল রোযার সাওয়াব পেয়ে যাবে"। সে পুনরায় বললো, "আমি রোযাদার"। তিনি পুনরায় বললেন, "খাও, তুমি গোটা বছরের রোযার সাওয়াব পেয়ে যাবে"। সে বললো, "আমি রোযাদার"। তিনি বললেন, "খাও, তুমি পুরো যমানার রোযার সাওয়াব পাবে"। সে আবারো বললো, "আমি রোযাদার"। তখন তিনি তার দিকে ক্রোধের দৃষ্টিতে দেখলেন। তখনই সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো এবং তার দেহ ফুলে গেলো। তা থেকে পুঁজ-রক্ত বের হতে লাগলো। তখন উপস্থিত শায়খগণ তার পক্ষে সুপারিশ করলেন এবং তাঁর রাগকে প্রশমিত করলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তার প্রতি সন্তুষ্ট হলেন আর সে পূর্বে যেমন ছিলো তেমনি হয়ে গেলো; যেন তার কোন কষ্টই হয়নি।

[সূত্র: বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা: **১১৯-১২০**, দ্র: স্ক্যান কপি-**১১**]

জাহেরীভাবে নামায না পড়া প্রসঙ্গ:

سمعت الشيخ أبا □فص عمر بن مسعود البزار ببغداد، يقول: ذكر قضيب البان عند شيخنا الشيخ محيي الدين عبد القادرؓ فقال : هو ولي مقرب، ذو □ال مع الله، وله قدم صدق عنده عز وجل، فقيل له : إنا لا نراه يصلي، فقال: إنه يصلي من □يث لا ترونه، ولا يخرج يوم وليلة، وعليه منهما فرض أبدا، وإني أراه إذا صلى بالموصل أو بغيرها من آفاق الأرض يسجد عند باب الكعبة

অনুবাদ: "শায়খ আবূ হাফস ওমর ইবনে মাসউদ বাযযারকে বাগদাদে বলতে শুনেছি, আমাদের শায়খ হযরত মুহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পবিত্র দরবারে শায়খ কাদ্বীব আল্ বানের ব্যাপারে বলা হলে তিনি বলেন, "তিনি আল্লাহ্‌র নৈকট্যধন্য অলি এবং আল্লাহ্ তাআলার সাথে 'হাল' বিশিষ্ট বুযুর্গ। মহান আল্লাহ্‌র নিকট তাঁর সত্য কদম রয়েছে। তাঁর দরবারে আরয করা হলো, **"আমরা তো তাঁকে (শায়খ কাদ্বীব আল্ বান) নামায পড়তে দেখিনা।"** তখন তিনি (গাউসুল আযম জিলানী ক.) বললেন, "তিনি ওখানে নামায পড়েন, যেখানে তোমরা তাঁকে দেখো না। তাঁর নিকট এমন কোন রাত ও দিন অতিবাহিত হয় না, যাতে তাঁর উপর কোন ফরয নামায অসম্পাদিত থেকে যায়। আমি তাঁকে দেখি যখন তিনি মসূলে নামায পড়েন কিংবা পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে, অথচ তিনি সাজদা করেন কা'বা শরিফের দরজার সামনে।"
[সূত্র: বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা: ৪৪৪-৪৪৫, দ্র: স্ক্যান কপি-১২]

নামায সম্পন্ন না করে ভেঙ্গে ফেলা প্রসঙ্গ:

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبي الحسن علي بن □سين الدمشقي، الموصلي . قال : أخبرنا الشيخ الأصيل أبو المفاخر عدي ابن الشيخ أبي البركات صخر بالموصل. قال: سمعت أبي ر□مه الله تعالى، يقول: مكث قضيب البان عندنا في الزاوية شهرا مستغرقا لا يأكل ولا يشرب، ولا يضع جنبه على الأرض، وكان عمي الشيخ

عدي ، يأتي إليه، ويقف على رأسه، ويقول: هنيئا لك يا قضيب البان، قد اختطفك الشهود الإلهي، واستغرقك الوجود الرباني. وكان يقول لمن ورد: سلم على ولي الله □قا، يشير إليه. قال: وصلى يوما معنا صلاة الصبح، خلف الإمام، فأتم منها ركعة، وقطع الثانية، وجلس إلى نا□ية عنا. فلما انصرفنا من الصلاة أتيته، وقلت له: يا قضيب البان لما لا تتم الصلاة معنا. قال: يا أبا البركات تعبت من عدوي خلف إمامكم، إنه أ□رم بالصلاة هنا،□م سافر إلى الشام،□م جاء إلى بغداد،□م انصرف إلى مكة، فلما جئنا إلى العقبة، تعبت فتركته ، قال : فأتيت الإمام وسألته عن ذلك، فقال: صدق والله، لقد كان وسواسي في صلاتى بهذا كله، يرينى في الركعة الثانية أني صاعد في العقبة

অনুবাদঃ আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবুল হাসান আলী ইবনে হুসাইন দামেস্কী মসূলী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই আসীল আবুল মাফাখির আদী ইবনে শায়খ আবুল বারাকাত সাখার, মসূলে। তিনি বলেন, আমি আমার পিতা (র.)-কে বলতে শুনেছি, শায়খ ক্বাদীব আল্ বান আমাদের নিকট হুজুরায় একমাস যাবৎ আল্লাহ্‌র ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। এ দীর্ঘ সময় তিনি না খেয়েছেন, না পান করেছেন, না মাটিতে পার্শ্বদেশ রেখেছেন। আমার চাচা শায়খ আদী তাঁর নিকট আসতেন এবং তাঁর শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং বলতেন, "হে ক্বাদীব আল্ বান, তোমাকে অভিনন্দন। 'শুহুদে ইলাহী' (আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য) তোমাকে উঠিয়ে নিয়েছে এবং 'ওজুদে রব্বানী' (আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব) তোমাকে নিমজ্জিত করেছে।" যে কেউ ওখানে আসতো তিনি তাদেরকে বলতেন, "আল্লাহ্‌র সত্য ওলীকে সালাম বলো।" একথা বলে তিনি তাঁর দিকে ইঙ্গিত করতেন। তিনি বলেন, **শায়খ ক্বাদীব আল্ বান (রাদ্বি.) একদা আমাদের সাথে ইমামের পেছনে ফজরের নামায পড়ছিলেন। অতঃপর এক রাকআত পড়লেন; কিন্তু দ্বিতীয় রাকআতে নামায ভঙ্গ করে ফেললেন**। তারপর আমাদের থেকে পৃথক হয়ে এক কোণায় বসে পড়লেন। যখন আমরা নামাযের সালাম ফেরালাম তখন আমি তাঁর নিকট আসলাম এবং বললাম, "হে ক্বাদীব আল বান, আপনি আমাদের সাথে নামায

পূর্ণ করেননি কেন?" তিনি বললেন, "হে আবুল বারাকাত, তোমাদের ইমামের পেছনে আমি দৌড়াতে দৌড়াতে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। তিনি নামাযের ইহরাম বাঁধলেন (তাকবীর-ই তাহরীমা বলে নামায শুরু করলেন) এখানে। অতঃপর সিরিয়া গেলেন, অতঃপর বাগদাদে এলেন, তারপর গেলেন মক্কায়। অতঃপর যখন আমরা ঘাঁটি পর্যন্ত পৌঁছলাম, তখন আমি ক্লান্ত হয়ে গেলাম এবং নামায ছেড়ে দিলাম।" তিনি বলেন, "অতঃপর আমি ইমামের নিকট এলাম এবং তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম।" তিনি (ইমাম) বললেন, "আল্লাহ্‌রই শপথ! তিনি সত্য বলেছেন। আমাকে এ পূর্ণ নামাযে একটি ওয়াসওয়াসাহ্ (কুমন্ত্রণা) পেয়ে বসেছিলো। দ্বিতীয় রাকআতেও আমাকে সামনের দিকে পথ দেখাচ্ছিলো। আমি ঘাঁটির দিকে আরোহণ করছিলাম।"

[সূত্রঃ বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠাঃ ৪৪৩, দ্রঃ স্ক্যান কপি-১৩]

শেখ আবু সাঈদ আবুল খায়ের (র.) কর্তৃক তাঁর মুরিদদের হজ্জের বিষয়ে দীক্ষা প্রদান প্রসঙ্গঃ

ونقل است کہ شیخ ابوسعید ابوالخیر ہر مریدی راکہ اندیشہ حج بودے بسرخک پیرابوالفضل فرمتاہے وگفتی آن خاک رازیارت کن وہفت بار گروآن بگرد وطواف آن خاک کن تاہمہ مقصود حاصل شود

অনুবাদঃ শেখ আবু সাঈদ আবুল খায়ের (র.)-এর মুরিদানের মধ্যে কেউ হজ্ব করার বাসনা প্রকাশ করলে তিনি তাঁদেরকে বলতেন, পীরে কামেল শেখ আবুল ফজল সাহেবের মাযার শরিফের মাটির জেয়ারত কর এবং তাঁর চারপাশে সাতবার তাওয়াফ কর– তোমার সমস্ত মকসুদ হাসেল হবে।

[সূত্রঃ মতালেবে রশীদী, পৃষ্ঠাঃ ১৪৩, দ্রঃ স্ক্যান কপি-১৪]

অধিকন্তু হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.)-কে তাঁর সম্মানিত পীর আদেশ করেন–

چوں مرادیدی خدارادیدۂ☆ گردکعبہ صدق.بر گردیدۂ

گرد من طوفی بکن ہفتاد بار ☆ ایں طوافی بہتر از کعبہ شمار

অনুবাদ: যখন আমাকে দেখেছ, মনে কর খোদাকে দেখেছ। হাকিকী কাবার চারপাশে তুমি তাওয়াফ করেছ। আমার চারপাশে সত্তর বার তাওয়াফ কর। এই তাওয়াফকে কাবার তাওয়াফের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে কর। [সূত্র: মসনবি শরিফ]

হযরত শেখ আহমদ সেরহিন্দি (র.)'র ভাষ্য– "নবির উপর অলির আংশিক প্রাধান্য" প্রসঙ্গ:

بعض ولیوں کو نبی پر جزئی فضیلت ہوتی ہے: ولی جو کمال بھی حاصل کرتا ہے اور جس درجہ تک بھی پہنچتا ہے وہ اپنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کے طفیل میں پہنچتا ہے۔ اگر نبی کی متابعت اور پیروی سے ہٹ جائے تو ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ بلند ترین درجات تک پہنچنا توبڑی بات ہے۔ لہٰذا اگر ولی کو چند جزئی فضیلتوں میں سے کوئی ایسی فضیلت حاصل ہو جائے جو نبی میں نظر نہیں آتی تھی اور اس ولی کو بلند درجات میں سے کوئی خاص در میسر ہو بھی جائے جو نبی کو میسر نہیں تھا پھر بھی یقیناً نبی کو بھی اس جزئی فضیلت اور اس خاص درجہ سے پورا پورا حصہ حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ ولی میں اس کمال کا حصول تو اس بنی کی پیروی ہی کے واسطہ سے ہے اور یہ سب کچھ اس نبی کی اتباع سنت کے نتائج ہی کا ایک حصہ ہے۔ پس لا محالہ نبی کو اس کمال سے مکمل حصہ حاصل ہو گا۔ جیسا کہ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ من سن سنۃ حسنۃ فلہ اجرہا واجر من عمل بہا (جس کسی نے کسی اچھے طریقے کی بنیاد رکھ دی تو اسے خود اس کا ثواب بھی اسے ملتا رہے گا اور تمام لوگوں کے برابر بھی ثواب ملے گا جو اس طریقے پر عمل کریں گے) ایسا ولی اس کمال کے حصول میں پیشرو ہو گا اور اس درجے تک پہنچنے میں مقدم ہو گا۔ اور ولی کی نبی پر اس قسم کی فضیلت حاصل ہونے کو علماء نے جائز قرار دیا ہے۔

অনুবাদ: "নবির উপর অলির আংশিক প্রাধান্য সম্পর্কে: অলি যে কামালাত-ই হাসিল করুন এবং যে স্তরে পৌঁছান না কেনো, তিনি স্বীয় নবি (আ.)-এর পায়রবীর তোফায়েল সেখানে পৌঁছান। যদি নবির অনুসরণ এবং পায়রবী না হতো, তবে ইমানই নসীব হতো না এবং উচ্চ মর্তবা হাসিলের রাস্তাও উন্মুক্ত হতো না। **সুতরাং কোনো অলি যদি আংশিক ফযিলতসমূহ থেকে এমন কিছু**

ফযিলত হাসিল করে, যা নবির লাভ হয়নি এবং যদি তার বুলন্দ দারাজাত বা উঁচু মরতবাসমূহ থেকে কোনো বিশেষ মরতবা নসীব হয়, যা নবির হাসিল হয়নি; এমতাবস্থায় এটা নিশ্চিত যে নবিরও এই আংশিক ফযিলত এবং খাস্ মরতবা হতে পূর্ণ অংশ হাসিল হয়। কেননা, অলির মধ্যে এই পূর্ণতা লাভ, ঐ নবির পায়রবীরই ফলশ্রুতি এবং এই সমস্ত কামালাত ঐ নবির সুন্নতের অনুসরণেরই ফলমাত্র। কাজেই, এটা নিশ্চিত যে, নবি ঐ কামালাতের পূর্ণ অধিকারী। যেমন রসুল পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ– 'যিনি কোনো নেক তরীকার প্রচলন করলেন, তিনি তার সওয়াব প্রাপ্ত হবেন এবং তিনি তাদের সমান সওয়াব পাবেন– যারা এর উপর আমল করবে'। অবশ্য অলি এই পূর্ণতা প্রাপ্তির কারণে পূর্ববর্তী এবং এই দরজায় পৌঁছানোর দিক দিয়ে সর্বপ্রথম হবেন। **আর অলির, নবির উপর এই ধরনের ফযিলত প্রাপ্তিকে আলেমগণ জায়েয বলেছেন।"**

[সূত্রঃ মাবদা ওয়া মা'আদ, মিনহাঃ ৫৭, দ্রঃ স্ক্যান কপি-১৫]

হযরত শেখ আহমদ সেরহিন্দি (র.)'র বর্ণনায় "রাসুল (দ.)'র বাক্যের মাঝে শয়তান বাক্য জুড়ে দেওয়া" প্রসঙ্গঃ

چنانچہ مروی ہے کہ ایک دن حضرت سید البشر صلی اللہ علیہ والہ وسلام مگائے ہوئے تھے۔ اور قریش کے سردار اور کفار کے رئیس بھی اس مجلس میں حاضر تھے۔ اور بہت سے اصحاب کرام بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت سید البشر صلی اللہ علیہ والہ وسلام نے سورہ نجم پڑھنی شروع کی۔ جب ان کے باطل خداؤں کا ذکر آیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلام کے کلام کے ساتھ شیطان نے اپنا کلام اس طرح ملا دیا کہ حاضرین نے اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلام ہی کا کلام سمجھا۔ اوراس میں کچھ تمیز نہ کر سکے۔ تو کافروں نے جو وہاں موجود تھے شور مچا دیا۔ اور کہتے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلام نے ہمارے ساتھ صلح کر لی ہے۔ اور ہمارے بتوں کی تعریف کی ہے۔ حاضرین اہل اسلام بھی اس کلام سے متحیر ہوگئے۔ اورآنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلام کو شیطان لعین کے کلام سے اطلاع نہ ہوئی۔ فرمایا کہ یہ کیا واقع ہے۔

اصحاب کرام ﷺ نے عرض کی کہ اثنائے کلام میں اس قسم کے فقرے حضور علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلام بہت متفکر اور غمناک ہوئے۔ اسی اثنا میں جبرئیل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ و السلام حاضر ہوئے اور وحی لائے کہ وہ کلام القائے شیطانی تھا۔ اور کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گذرا ہے۔ جس کے کلام میں شیطان نے القانہ کیا ہو۔ پس ازاں اللہ تعالے نے اس کو رد کیا ہے۔ اور اپنے کلام کو محکم کیا ہے۔

پس جب آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلام کی زندگی میں بیداری کے وقت صحابہ کی مجلس میں شیطان لیعن نے اپنے کلام باطل کو آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلام کے کلام میں القا کر دیا۔ اور کسی نہ تمیز نہ کی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلام کی وفات کے بعد خواب کی حالت میں جو خواس کے معطل و بیکار ہونے کا محل اور شک و شبہی کا مقام ہے باوجود دیکھنے والے کی تنہائی کے کہاں سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ واقع شیطانی کے تصرف اور مکر و فریب سے محفوظ اور مامون ہے۔

অনুবাদ: "একদিন রাসুলুল্লাহ্ (দ.) মজলিসে উপবিষ্ট ছিলেন, কুরাইশদের প্রধান ব্যক্তি ও কাফেরদের সরদারগণ এবং বহুসংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রাসুল (দ.) তাদেরকে সূরা 'আন নাজম্' পাঠ করে শুনাচ্ছিলেন। **যখন বাতেল বা অমূলক প্রতিমাগুলোর আলোচনা আসল, তখন শয়তান উক্ত প্রতিমাগুলোর প্রশংসাবাচক কতিপয় বাক্য রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র বাক্যের সাথে এমনভাবে সংযোগ করে দিল যে, উপস্থিত সভাস্থ সকলেই বুঝল যে, এগুলো নবি করিম (দ.)-এরই বাক্য। কোনভাবেই কেউ তা পার্থক্য করতে সক্ষম হলো না। উপস্থিত কাফেররা কোলাহল শুরু করে দিল যে, মোহাম্মদ (দ.) আজ আমাদের সাথে মীমাংসা করলেন এবং আমাদের প্রতিমাগুলোর প্রশংসা করলেন। সভাস্থ মুসলিমগণও এতে অস্থির হয়ে পড়লেন। কিন্তু রাসুল (দ.) শয়তানের বাক্য কিছুই বুঝতে না পেরে বললেন যে, "কি ঘটনা হল"? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন যে, এই বাক্যসমূহ আপনার বাক্যের সাথে প্রকাশ পেয়েছে।** তখন রাসুল (দ.) বিশেষ চিন্তিত হলেন। ইতোমধ্যে হযরত

জিব্রাঈল (আ.) অহি নিয়ে আগমন করলেন যে, "এই বাক্যসমূহ শয়তানের নিক্ষিপ্ত বাক্য এবং **এমন কোন নবি বা রাসুল অতিবাহিত হননি যে, শয়তান তাঁদের বাক্যের মধ্যে কিছু না কিছু নিক্ষেপ না করেছে।** অতঃপর আল্লাহ্পাক এই বাক্যগুলোকে রদ্দ বা বাতিল করে স্বীয় কালাম বা বাক্যকে সুদৃঢ় করেছেন"। **অতএব যখন নবি করিম (দ.)'র জীবনকালে জাগ্রত অবস্থায় সাহাবাগণের উপস্থিতিতে, তাঁর বাক্যের মধ্যে শয়তান স্বীয় বাতুল বাক্য এমনভাবে নিক্ষেপ করেছিল যে, কেউই তা ধরতে সক্ষম হননি, তখন রাসুল (দ.)'র ইন্তেকালের পর এবং নিদ্রাবস্থায় যা ইন্দ্রিয় শৈথিল্য অবস্থা, সন্দেহের স্থান ও স্বপ্ন দর্শক একাকী, সেই অবস্থায় সে কিভাবে অবগত হতে পারবে যে, উক্ত ঘটনা শয়তানের কবল মুক্ত এবং তার চক্রান্ত হতে সুরক্ষিত।"**

[সূত্রঃ মাকতুবাত শরিফ, মকতুব নংঃ ২৭৩, দ্রঃ স্ক্যান কপি-১৬]

এই ঘটনাগুলো শরিয়তের বাহ্যিক নীতি-বিধানের আলোকে বিবেচনা করলে আপত্তিকর বলে মনে হবে। কেননা কোন রোযাদার মানুষকে খাবার খাওয়ার জন্য জোর করে নির্দেশ দেওয়া, জাহেরীভাবে নামায আদায় না করা, নামাযের জামাতে এক রাকাত নামায আদায় করে নামায ভঙ্গ করে চলে যাওয়া, কেউ হজ করতে চাইলে তাকে কাবা শরিফ না গিয়ে কোন অলির মাযার জেয়ারত করার নির্দেশ প্রদান করা, পীরকে দেখা মানে খোদাকে দেখা মনে করা এবং পবিত্র কাবা শরিফের তাওয়াফ হতে পীরকে তাওয়াফ করাকে শ্রেষ্ঠ মনে করা ইত্যাদি বাহ্যত শরিয়তের বিপরীত কর্ম। কিন্তু এ কাজ যেহেতু আল্লাহ্র মকবুল অলি থেকেই প্রকাশিত সুতরাং এগুলো বিবেচনা করতে হবে অলি আল্লাহ্র বিশেষ হেকমতপূর্ণ কাজ হিসেবে। আবার প্রায় সর্ব মহলের দৃঢ় বিশ্বাস হলো, ফযিলতের দিক দিয়ে অলির তুলনায় নবিগণ শ্রেষ্ঠ। কেননা তাঁরা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিশেষভাবে নির্বাচিত এবং অতি মর্যাদাপূর্ণ পদের অধিকারী। **কিন্তু উপরে উল্লেখিত হযরত শেখ আহমদ সেরহিন্দি (র.)'র ভাষ্যমতে– 'কোন কোন অলি নবির উপরে আংশিক ফযিলতেরও অধিকারী হন'। পরন্তু মকতুবাত গ্রন্থের যে বর্ণনাটি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে তাতে তিনি বলেছেন– 'রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র কথার মাঝে শয়তান এমনভাবে কথা যুক্ত করে দিয়েছে যে, স্বয়ং রাসুলুল্লাহ্ (দ.)ও বুঝতে পারেননি'। আপাত দৃষ্টিতে তাঁর এই উভয় বক্তব্যই চরম**

আপত্তিকর। কিন্তু যেহেতু তিনি জগতখ্যাত একজন অলি আল্লাহ্, সেহেতু তাঁর এই বক্তব্যগুলোর সমালোচনা হতে বিরত থেকে এগুলো তাঁর বিশেষ একটি অবস্থার বক্তব্য হিসেবে বিবেচনা করাই শ্রেয়।

গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.) মাইজভাণ্ডারী থেকেও অনেক রহস্যপূর্ণ ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে। যেমন– বেলায়তে মোত্লাকা গ্রন্থের নবম পরিচ্ছেদে আছে হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী "হেদায়েত আলীকে রমযান মাসে সরবত পান করাইলে হযরত কেবলার সহধর্মিণীর প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন 'তাঁহাকে সাফ করিয়া দিলাম'।" এই ঘটনার রহস্য সম্পর্কে উক্ত গ্রন্থেই উল্লেখ আছে– "ইহা তাঁহার ফয়জে এলকায়ী, যাঁহা স্পর্শ মণিবৎ দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কিমিয়া সদৃশ্য ছালেকের ধাতজ মেজাজ ও মূল্যমান বদলাইয়া দেয়।" একইভাবে "আব্দুর রহমান মিয়াকে রমজানের দিনে সরবত পান করাইলে, ছায়াদ উদ্দীনের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন– 'আমার ছেলেরা সব সময় রোযা রাখে'।" এই ঘটনার রহস্য সম্পর্কে উক্ত গ্রন্থেই উল্লেখ আছে– "ইহা তাঁহার বেলায়তে মোত্লাকার অধিকার এবং রহস্য প্রাধান্যের প্রমাণ। যেহেতু পাপকার্য হইতে বিরত থাকার নামই রোযা বা রোযার মূল উদ্দেশ্য"। এবং রেফারেন্স হিসেবে 'তাফসীরে হোসাইনী' ও 'তাফসীরে ইবনু আরাবী'র খণ্ড এবং পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর এই ঘটনাগুলোও মূলত রহস্যপূর্ণ। যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে কিংবা শরিয়তের তথা ফিক্হী নীতির আলোকে আপত্তিকর মনে হওয়াও স্বাভাবিক। কিন্তু যেহেতু গাউসুল আযমের মতো মহান একটি পদাধিকারী সত্তা থেকে এই ঘটনার প্রকাশ, সুতরাং আমাদের জ্ঞান-বিবেচনার সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনায় রেখে বুঝে নিতে হবে এগুলো হযরত খিজির (আ.)'র ঘটনার মত আল্লাহ্র অলির হেকমতপূর্ণ ঘটনা। এ নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করা মানে আল্লাহ্র অলির কর্মের উপর প্রশ্ন তোলা। যা অন্তত ত্বরিকত ও তাসাওউফ পন্থি মানুষের জন্য কোনভাবেই সঙ্গত নয়।

বেলায়তে মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদী
এবং
বেলায়তে মোতলাকায়ে আহমদী যুগ

[বেলায়তে মোত্‌লাকাঃ পৃষ্ঠা- ৬৫, তৃতীয় প্রকাশের পুনঃপ্রকাশ]

আল্লাহ্‌র রাসুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামার জাতে পাকে (পবিত্র সত্তায়) নবুয়ত ও বেলায়ত দুটোই পরিপূর্ণভাবে রয়েছে। উপরন্তু তাঁর জাতে পাকে যে বেলায়ত রয়েছে এর দুটি ধারা– একটি হচ্ছে তাঁর যাহেরী নাম 'মোহাম্মদ'র সত্তায় বিকশিত 'বেলায়তে মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদী' এবং অপরটি হচ্ছে তাঁর বাতেনী নাম 'আহমদ'র সত্তায় বিকশিত 'বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহমদী'।

এটা সবার জানা বিধান যে, ইসলাম স্থান-কাল-পাত্র-পরিবেশ-প্রতিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনা করে সব সময়ের জন্য উপযুক্তভাবে বিধান দিতে পারে। ইসলামকে সর্বাধুনিক জীবনব্যবস্থা বলার নেপথ্যে এটি অন্যতম কারণ। আল্‌ কুরআনকে সব যুগ-সময়ের উপযোগী জীবন-বিধান বলা হয়। রাসুলুল্লাহ্‌ (দ.) পৃথিবী থেকে (যাহেরীভাবে) বিদায় নেওয়ার সাথে সাথে নবুয়তের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু হেদায়তের ধারা তো চলমান থাকতে হবে। তাই রাসুলুল্লাহ্‌ (দ.)'র যে দুটো বেলায়তের ধারা বিদ্যমান রয়েছে তা সময়ের আবর্তন-বিবর্তনের আলোকে, স্থান-কাল-পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে দু-ভাবে বিকশিত হয়েছে। মহান রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন– وَلَا يَكُوْنُوْا

كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ

অর্থ: "আগে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের মতো যেন ওরা না হয়, দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর যাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে পড়েছিল। তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী" [সূরা হাদিদঃ আয়াতাংশ, ১৬]। এই আয়াতে করিমায় একটি কঠিন বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কিতাব কিংবা সতর্কবার্তা আসার পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার কারণে খোদা বিমুখ হয়ে যাওয়া, গাফেল হয়ে যাওয়া, ধর্ম থেকে দূরে সরে যাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। অর্থাৎ এ পরিস্থিতিটা আগেও হয়েছে এবং সামনেও হওয়ার পুরোপুরি সম্ভাবনা আছে। ঠিকই রাসুলুল্লাহ্ (দ.) দুনিয়া থেকে পর্দা করার পর দীর্ঘ প্রায় পাঁচশত বছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার কারণে মানুষ প্রবৃত্তিমুখী হয়ে পড়ে। অনাচার, বিশৃঙ্খলা বেড়ে যায়। ঠিক এই সময়েই মহান রাব্বুল আলামিন শাহানশাহে বাগদাদ গাউসুল আযম শায়খ সৈয়দ মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (ক.)-কে বেলায়তের সর্বোচ্চ পদাধিকারী হিসেবে এই পৃথিবীতে পাঠান 'মুহিউদ্দিন' বা মৃতপ্রায় ধর্মকে পুনর্জীবনদানকারী হিসেবে। কিন্তু তাঁর সময়ে মুসলিম হুকুমতের প্রাধান্য ছিল বিধায় তিনি রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র মোহাম্মদী নামের সত্তায় বিকশিত 'বেলায়তে মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদী' পন্থা অবলম্বন করে মানুষকে হেদায়তের পথে পরিচালিত করার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মোকাইয়াদ তথা শৃঙ্খলিত পন্থা অবলম্বন করার কারণ হলো সেই সময়ের বাস্তবতা। যেহেতু তখন মুসলিম হুকুমতের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল, সেহেতু সেই সময়ে বেলায়তে মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদী পন্থাই অধিক উপযোগী ছিল।

এরপর আরও দীর্ঘ প্রায় পাঁচ শতাধিক বছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার কারণে মানুষ আরও প্রবৃত্তিমুখী হয়ে পড়ে। অনাচার, বিশৃঙ্খলা বেড়ে যায়। এমনকি নীতি-নৈতিকতা মরে যায়। মোটামুটি থাকে শুধু ধর্মের আচার-আচরণগত দিক। ঠিক আবার এই সময়েই মহান রাব্বুল আলামিন গাউসুল আযম শায়খ সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)-কে বেলায়তের সর্বোচ্চ পদাধিকারী হিসেবে এই পৃথিবীতে পাঠান 'মুহিউদ্দিন' বা মৃতপ্রায় ধর্মকে পুনর্জীবনদানকারী হিসেবে। উপরন্তু তাঁর সময়ে আগেকার মুসলিম হুকুমতের অস্তিত্বও বিলীন হয়ে যায়। এরূপ পরিস্থিতিতে রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র বাতেনী নাম 'আহমদ'র সত্তায় বিকশিত

'বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহমদী' পন্থাই অধিক উপযোগী। তাই তিনি বেলায়তের মোত্‌লাক পন্থা অবলম্বন করে মানুষকে হেদায়তের কার্যধারা পরিচালিত করেন। সুতরাং একটি বিষয় স্পষ্ট যে, বেলায়তে মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদী এবং বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহমদী উভয়ই রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র জাতে পাকের বেলায়ত। সময়, পরিবেশ, বিশ্ব ব্যবস্থার বাস্তবতার আলোকে হুযুর গাউসুল আযম হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (ক.)'র যুগে বেলায়তে মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদী অধিক উপযোগী বিধায় তা তাঁর সত্তায় মোকাইয়াদ তথা শৃঙ্খলিত বেলায়ত প্রকাশ পায় এবং গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র যুগে বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহমদী অধিক উপযোগী বিধায় তাঁর সত্তায় এই মোত্‌লাক তথা উন্মুক্ত বেলায়ত প্রকাশ পায়। এতে একের উপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায় না, বরং সময়ের বাস্তবতায় যখন যে নীতি উপযুক্ত তা গ্রহণ করার বাস্তবতাই প্রকাশিত হয়। পরন্তু এই দুই মহান অলি আল্লাহ্ যে– বেলায়তে মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদী এবং বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহমদীর তাজের অধিকারী তা আরও স্পষ্ট হয় ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা আযিযুল হক শেরে বাংলা (র.) রচিত দিওয়ানে আযিযের নিম্নোক্ত ক্বসিদা থেকে–

"তা-জ দো বূ-দাহ বদস্তে সরওয়ারে পয়্‌গাম্বরাঁ
এক নেহাদাহ বর সরে শাহ আহমদ উল্লাহ্ বে গুমাঁ"

অর্থঃ "রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র নিকট বেলায়তে ওজমা বা শ্রেষ্ঠ বেলায়তের দুইটি সম্মান প্রতীক বা তাজ ছিল (যা বেলায়তে মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদী ও বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহমদী বলে বুঝা যায়), এই সম্মান প্রতীক বা তাজ দুইটির মধ্যে একটি হযরত আহমদ উল্লাহ্ (ক.)'র মস্তক মোবারকে নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত।"

"তা-জে দী-গর বর সরে আঁ- শা-হে জি-লা-নী নেহা-দ
যাঁ সবব বর গরদানে হার আউলিয়া পা-য়শ নেহা-দ"

অর্থঃ "অপর মুকুটটি ওই শাহে জিলান (ক.)'র শির মোবারকে পরিধান করিয়ে দিয়েছেন, এ কারণেই তাঁর চরণ মোবারক (সম-সাময়িক) প্রত্যেক অলির ঘাড় মোবারকে স্থাপিত।"

মোহাম্মদী এবং আহমদী যুগ প্রসঙ্গে হযরত শেখ আহমদ সেরহিন্দি (র.)'র ভাষ্য:

حقیقت محمدی کی حقیقت کعبہ تک رسائیٔ: یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ جس طرح کعبہ کی ظاہری صورت چیزوں کی صورتوں کی مسجود ہے (ہر مخلوق کعبۃ اللہ کو سجدہ کرتی ہے) اسی طرح تمام اشیاء کے حقائق بھی حقیقت کعبہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ کعبۃ اللہ مسجود خلائق بھی ہے اور مسجود حقائق بھی میں یہاں ایک نکتہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو آج تک نہ آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا اور نہ پہلے بزرگوں نے اسے بیان فرمایا ہے۔ یہ نکتہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے بتایا ہے اور اس کا خصوصی الہام مجھ پر ہی عنایت ہوا ہے ایک ہزار سے کچھ سال زیادہ گزر گئے ہیں۔ حضور سید الانبیا کی رحلت ہوئی آج وہ وقت آ گیا ہے جب حقیقت محمدی عروج کر کے حقیقت کعبتہ تک رسائی کر رہی ہے آج حقیقت محمدی اپنے عروج سے حقیقت کعبہ میں متحد ہو گئی ہے۔ آج سے حقیقت محمدی کا دوسرا نام حقیقت احمدی ہوگا اور ذات احمد کا مظہر بن جائے گا۔ یہ دونوں مبارک نام (محمد - احمد) حقیقت محمدی اور حقیقت کعبہ میں یکجا ہو جائیں گے۔ حقیقت محمدی کا پہلا مقام خالی ہو جائے گا اور یہ مقام اس وقت تک خالی رہے گا۔ جب تک حضرت عیسی علیہ السلام نزول فرمائیں گے اور نزول فرمانے کے بعد شریعت محمدی کے مطابق عمل کریں گے اس وقت حقیقت عیسوی عروج کر کے حقیقت محمدی کی جگہ کے خلا کو پر کرے گی۔

অনুবাদ: "প্রকাশ থাকে যে, কাবার সুরত বা আকৃতি যেমন বস্তুর সুরতের সিজদার স্থান, তদ্রুপ হাকীকতে কাবাও ঐ সমস্ত বস্তুর হাকীকতের সিজদার জায়গা। এখন আমি একটি আশ্চর্য ধরনের কথা বলবো, যা এর আগে কেউই শোনেনি এবং কোনো বর্ণনাকারী একথা বর্ণনা করেননি। এই রহস্য আল্লাহ্ সুবহানুহু ওয়া তায়া'লা তাঁর একান্ত অনুগ্রহে কেবলমাত্র ইলহামের মাধ্যমে আমাকে জানিয়েছেন। **উক্ত রহস্য এই, 'সারওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের এক হাজার বৎসরের পরে এমন এক যামানা আসবে, যখন হাকীকতে মোহাম্মদী স্বীয় মাকাম থেকে উরুজ বা ঊর্ধ্বগমন করে**

হাকীকতে কাবার সঙ্গে মিলিত হবে। এ সময় হাকীকতে মোহাম্মদীর নাম হবে হাকীকতে আহমদী এবং তা 'যাতে আহাদ' বা একক যাতের জাল্লা সুলতানুহুর প্রকাশস্থল হবে। তখন উভয় মুবারক নাম (মোহাম্মদ ও আহমদ), হাকীকতে মোহাম্মদী ও হাকীকতে কাবার মধ্যে স্থিত হবে। এ সময় হাকীকতে মোহাম্মদীর প্রথম মাকাম (যেখানে তা ইতোপূর্বে ছিলো) খালি থাকবে এবং তা ততোদিন খালি থাকবে, যতোদিন না হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম অবতরণ করবেন। তিনি অবতরণের পর শরিয়তে মোহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর আমল করবেন। এই সময় হাকীকতে ঈসুবী স্বীয় মাকাম হতে উরুজ বা উর্ধ্বগমন করে হাকীকতে মোহাম্মদীর (দ.) শূন্যস্থানে অবস্থান গ্রহণ করবে, যা এতোদিন খালি ছিলো।"

[সূত্রঃ মাবদা ওয়া মা'আদ, মিনহাঃ ৪৮, দ্রঃ স্ক্যান কপি-১৭]

প্রাণহীন দুর্বল শরিয়তী ব্যবস্থা যুগে নৈতিক ধর্ম প্রধান এক বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহমদী যুগের আবশ্যকতা অপরিহার্য হইয়া পড়ে

[বেলায়তে মোত্‌লাকাঃ পৃষ্ঠা- ২৩, তৃতীয় প্রকাশের পুনঃপ্রকাশ]

শরিয়তী ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ার অর্থ কখনোই এই নয় যে– 'রাসুলুল্লাহ্ (দ.) প্রদত্ত শরিয়ত দুর্বল হয়ে পড়েছে'। **'শরিয়ত' এবং 'শরিয়তী ব্যবস্থা'র মাঝে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। শরিয়ত হলো আল্লাহ্ প্রদত্ত সুস্পষ্ট বিধি-বিধান। যা চিরন্তন এবং সর্বাবস্থায় কার্যকরী। আর এই বিধি-বিধান সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থাপনার দরকার এবং সেই ব্যবস্থাপনাকেই বলা হয় শরিয়তী ব্যবস্থা।** এই ব্যবস্থাপনা পরিচালনার দায়িত্ব মুসলিম উম্মাহ্‌র উপরই ন্যস্ত। পরিবর্তিত বিশ্বের পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনা করে মুসলিম উম্মাহ্‌কে চিন্তা, গবেষণা, তাজদিদ, ইজতিহাদের মাধ্যমে এই ব্যবস্থাপনাকে সচল রাখতে হবে। উপযুক্ত মুসলিম নেতৃত্বের মাধ্যমে যদি এই ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয়, তবে তা সবল থাকে। পক্ষান্তরে দুর্বল নেতৃত্বের মাধ্যমে যদি তা পরিচালিত হয়, তবে তা (শরিয়তী ব্যবস্থাপনা) দুর্বল হওয়াটাই স্বাভাবিক। তারই বাস্তবতায় ১৭৬০ সালে বাংলাদেশ তথা ধীরে ধীরে পুরো ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ হুকুমত প্রতিষ্ঠার ফলে মুসলিম সমাজ রাষ্ট্রের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে নানা সমস্যা ও দুর্যোগের সম্মুখীন হয়। ফলে এরূপ অবস্থায় মুসলমানদের 'শরিয়তী ব্যবস্থাপনা'ও দুর্বল হয়ে পড়ে। বেলায়তে মোত্‌লাকা গ্রন্থে "শরিয়তী ব্যবস্থা প্রাণহীন ও দুর্বল হয়ে পড়ে" বলতে মূলত শরিয়তী ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রটা যে প্রাণহীন ও দুর্বল হয়ে পড়েছিল সেটাই বুঝানো হয়েছে।

উপরন্তু দীর্ঘ সময়ের আবর্তন বিবর্তনের ফলে মানুষের মাঝে নীতি-নৈতিকতা বোধ এবং ধর্মীয় আদর্শ লোপ পাওয়ার বিষয়টি অনস্বীকার্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ
وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

অর্থঃ "পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের মতো যেন ওরা না হয়, বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তকরণ কঠিন হয়ে পড়েছিল। তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী। জেনে রাখ– আল্লাহ্ই পৃথিবীকে এর মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন" [সূরা হাদিদঃ আয়াতাংশ, ১৬-১৭]।

এজন্যই পরপর নবি-রাসুল আগমনের ধারা অব্যাহত থেকেছিল। আমাদের প্রিয় নবি হুযুর পুরনুর (দ.)'র আগমনের মাধ্যমে নবুয়তের ধারা পরিসমাপ্তি ঘটার পরও দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর মানুষের মাঝে ধর্মীয় নীতি-নৈতিকতা এবং ইসলামের আধ্যাত্মিক দিকের বিপর্যয় ঘটার মাধ্যমে প্রাণ-বাফু যায় যায় অবস্থায় পতিত হয়, তখন রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র বেলায়তে মোহাম্মদীর যুগশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী হিসেবে 'মুহিউদ্দীন' লকব নিয়ে গাউসুল আযম শায়খ সৈয়দ আব্দুল কাদের জীলানী (ক.)'র আগমন অনিবার্য হয়ে পড়ে। মুহিউদ্দীন অর্থ হলো ধর্মের পুনর্জীবনদানকারী। ইসলাম ধর্ম মৃতপ্রায়, প্রাণ যায় যায় অবস্থা তথা একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ার কারণেই তো মুহিউদ্দীন তথা ধর্মের পুনর্জীবনদানকারীর প্রয়োজন হয়েছে। সুতরাং মুহিউদ্দীন লকব যদি আপত্তিকর না হয় তবে "শরিয়তী ব্যবস্থা প্রাণহীন ও দুর্বল হয়ে পড়ে" এই বিষয়টিও আপত্তির ঊর্ধ্বের বিষয় হিসেবেই পরিগণিত হবে।

তাঁহার (গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী) বেলায়ত পরম উন্নীত বেলায়ত। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.) এর মত পূর্ববর্তী বাধাযুক্ত বেলায়ত যুগের অবসানকারী– বাধামুক্ত বেলায়ত যুগের অধিকারী

[বেলায়তে মোত্লাকা: পৃষ্ঠা- **১২৫**, তৃতীয় প্রকাশের পুনঃপ্রকাশ]

তাঁহার বেলায়ত পরম উন্নীত বেলায়ত: স্তরের দিক দিয়ে বেলায়ত তিনভাগে বিভক্ত–

১. বেলায়তে সোগরা– যাঁরা বেলায়তী ক্ষমতা লাভে সাধারণ মুমিনের ঊর্ধ্বে স্থান পেয়েছেন।

২. বেলায়তে ওসতা– যাঁরা বেলায়তী ক্ষমতায় ফেরেশ্তার ঊর্ধ্বে মধ্যম মর্যাদা লাভ করেছেন।

৩. বেলায়তে ওজমা বা কোবরা– যাঁরা বেলায়ত অর্জনে সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছেন।

এই কথা সর্বজন বিদিত যে, হুযুর গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.) মাইজভাণ্ডারী হলেন– বেলায়তে ওজমার অধিকারী ফরদুল আফরাদ অলি আল্লাহ্। তাঁর বেলায়তে ওজমা এবং গাউসুল আযমিয়্যতের ব্যাপারে সমকালীন অসংখ্য আউলিয়ায়ে কেরাম স্বীকৃতি দিয়েছেন। যেমন– ইমাম শেরে বাংলা (র.) দিওয়ানে আযিযে বলেন– "তা-জ দো বূ-দাহ বদস্তে সরওয়ারে পয়্গাম্বরাঁ, এক নেহাদাহ বর সরে শাহ্ আহমদ উল্লাহ্ বে গুমাঁ" – অর্থ: "রসুলুল্লাহ্ (দ.)'র নিকট বেলায়তে ওজমা বা শ্রেষ্ঠ

বেলায়তের দুইটি সম্মান প্রতীক বা তাজ ছিল (যা বেলায়তে মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদী ও বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহমদী বলে বুঝা যায়), এই সম্মান প্রতীক বা তাজ দুইটির মধ্যে একটি হযরত আহমদ উল্লাহ্‌ (ক.)'র মস্তক মোবারকে নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত।" **যেহেতু বেলায়তে ওজমা শব্দের অর্থই হলো– সর্বোচ্চ বেলায়ত, চূড়ান্ত বেলায়ত তথা বেলায়তের পরম স্তর, তাই বেলায়তে মোত্‌লাকা গ্রন্থে হুযুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর বেলায়ত প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে যে– "তাঁহার বেলায়ত পরম উন্নীত"।** অর্থাৎ তিনি বেলায়তে ওজমার অধিকারী। এ ধরনের বেলায়তের পরমতা বিষয়ে শুধুমাত্র হুযুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়নি বরং হুযুর গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী (ক.)'র জীবনী গ্রন্থেও (তাঁর শানে) এ ধরনের বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়। যেমন "বাহজাতুল আসরার" গ্রন্থে হুযুর গাউসে পাক প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে– ولا وجود اتم من وجوده **অর্থ:** "কোন অস্তিত্ব তাঁর (গাউসুল আযম জিলানী) চেয়ে বেশী পরিপূর্ণ নয়"। [সূত্র: বাহজাতুল আসরার (আরবী), পৃষ্ঠা–১৭৮] এটিও হচ্ছে হুযুর গাউসে পাকের বেলায়তে ওজমার বহিঃপ্রকাশ। অর্থাৎ তাঁর বেলায়তও পরম উন্নীত বেলায়ত।

হযরত মোহাম্মদ (দ.)'র মত পূর্ববর্তী বাধাযুক্ত বেলায়ত যুগের অবসানকারী– বাধামুক্ত বেলায়ত যুগের অধিকারী: পূর্ববর্তী যত নবি-রাসুল ছিলেন তাঁরা সকলেই সুনির্দিষ্ট কোন অঞ্চল-গোত্র-সম্প্রদায় কিংবা জাতি-গোষ্ঠীর জন্য প্রেরিত হয়েছেন। তাই তাঁদের নবুয়তকে 'নবুয়তে খাস্‌সাহ' বলা হয়। কিন্তু আখেরী নবি রাহমাতুল্লিল আলামিন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.) সমগ্র বিশ্বের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। তাই তাঁর নবুয়তকে 'নবুয়তে আম্মাহ' বলা হয়। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের কিংবা ধর্মের মানুষ রাসুলুল্লাহ্‌ (দ.)'র অনুসরণের মাধ্যমে উভয় জাহানের কল্যাণ হাসিলের ক্ষেত্রে কোনরূপ বাধা নেই। অর্থাৎ তিনি হলেন পূর্ববর্তী বাধাযুক্ত নবুয়তের অবসানকারী এবং বাধামুক্ত নবুয়তের অধিকারী।

প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, রাসুলুল্লাহ্‌ (দ.)'র জাহেরী নাম 'মোহাম্মদ' এবং বাতেনী নাম 'আহমদ'। এই নামদ্বয়ের সত্তায় বেলায়তের দুটো ধারা বিদ্যমান। একটি মোহাম্মদী এবং অপরটি আহমদী। রাসুলুল্লাহ্‌ (দ.)'র ইন্তেকালের প্রায় পাঁচশত বছরের ব্যবধানে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ ইসলামের রূহানী এবং নৈতিক দিক হারিয়ে শুধুমাত্র ধর্মের আচার-নীতি পালনসর্বস্ব হয়ে পড়ে এবং

ফেরকাকেন্দ্রিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে যায়। ইসলামের রূহানী এবং নৈতিক দিক উপেক্ষিত হওয়ার কারণে ইসলামের প্রাণশক্তি মৃতপ্রায় অবস্থায় পতিত হয়। ঠিক সেই সময় 'মুহিউদ্দীন' তথা ধর্মের পুনর্জীবনদানকারীরূপে রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র মোহাম্মদী বেলায়তের ঝাণ্ডা নিয়ে হুযুর গাউসে পাক (ক.)'র আবির্ভাব ঘটে। যেহেতু তখন মুসলিম হুকুমতের প্রাধান্য ছিল সেহেতু তিনি মোকাইয়াদ তথা শৃঙ্খলিত নীতির আলোকে ত্বরিকত পন্থা গ্রহণ করেন। তৎপরবর্তী আরও প্রায় পাঁচ শতাধিক বছর পরে মুসলিম উম্মাহ্ পুনরায় নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে। ধর্মীয় উগ্রবাদ এবং নাস্তিকতাবাদের চরম অপতৎপরতায় ইসলামের প্রাণ-শক্তি পুনরায় যায় যায় অবস্থায় পৌঁছে। এরূপ সন্ধিক্ষণে 'মুহিউদ্দীন' তথা ধর্মের পুনর্জীবনদানকারী রূপে রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র বেলায়তে আহমদীর ঝাণ্ডা নিয়ে হুযুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর আবির্ভাব ঘটে। এই যুগে যেহেতু মুসলিম হুকুমতের কোন অস্তিত্ব বিদ্যমান নেই সেহেতু তিনি মোত্‌লাক তথা বাধামুক্ত নীতির আলোকে ত্বরিকত পন্থা অবলম্বন করেন। এজন্য হুযুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর বেলায়তকে বেলায়তে মোত্‌লাকা তথা উন্মুক্ত বেলায়ত বলা হয়। যে কোন ত্বরিকা-মাযহাব কিংবা মত ও পথের মানুষ হুযুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর ত্বরিকার অনুসরণের মাধ্যমে কল্যাণ হাসিলের ক্ষেত্রে কোনরূপ বাধা নেই। **অর্থাৎ রাসুলে করিম (দ.) যেভাবে পূর্ববর্তী বাধাযুক্ত নবুয়ত যুগের অবসানকারী এবং বাধামুক্ত নবুয়ত যুগের অধিকারী অনুরূপভাবে রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র আহমদী বেলায়ত রহস্যের ধারক হিসেবে হুযুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)ও পূর্ববর্তী বাধাযুক্ত বেলায়ত যুগের অবসানকারী এবং বাধামুক্ত বেলায়ত যুগের অধিকারী।**

(বেলায়তে মোত্‌লাকা) বিধান ধর্ম ও রীতিনীতি বা রেওয়াজ হইতে খোদার ইচ্ছা শক্তিকে অধিকতর প্রাধান্য দেয়

[বেলায়তে মোত্‌লাকাঃ পৃষ্ঠা- ২৩, তৃতীয় প্রকাশের পুনঃপ্রকাশ]

সর্বকালের যাবতীয় পরিবেশ-প্রতিবেশ-পরিস্থিতির জন্য যথাযথভাবে প্রয়োগযোগ্য মহান ঐশীগ্রন্থ আল্‌ কুরআন যেই পাঠকই পড়ুক না কেন, এখানে একটি সূত্র বদ্ধমূল ধারণায় রাখতে হবে যে, পুরো আল্‌ কুরআন না পড়ে নির্দিষ্ট একটি আয়াতে করিমা বাস্তবায়ন করতে গেলে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা-ই বেশি। কারণ আছে নিশ্চয়। কী কারণ– অনেক সময় একই বিষয়ের উপর পবিত্র কুরআনে একাধিক জায়গায় একাধিক আয়াতে করিমা আছে কিংবা এমনও হয়ে থাকে, একটি আয়াতের পরিপূর্ণ অর্থ বুঝতে হলে অন্য আয়াতকে বিবেচনায় রাখতে হয়। আল্‌ কুরআনে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে কী ধারণা দেওয়া হয়েছে তা মূলত এভাবেই হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। এটি একটি অবিসংবাদিত নীতি। আর এই নীতি পৃথিবীর অন্যান্য বইয়ের ক্ষেত্রেও বেশিরভাগ সময়ই প্রযোজ্য। একটি বইয়ের নির্দিষ্ট কোন প্রবন্ধে একটি তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধে তথ্যটি পড়ে পাঠক এক ধরনের অর্থ খুঁজে নেন বা এমনও হয়, পাঠক বইটির লেখককে পুরোপুরি ভুল বুঝতে শুরু করেন। কিন্তু দেখা গেল, মূলত পাঠক লেখকের চিন্তা বা প্রসঙ্গের ধারে কাছেও যেতে পারেননি। কারণ পুরো ব্যাপারটা বুঝতে হলে বইটির ভূমিকাসহ পুরো বই পড়তে হবে। মূলকথা কী দাঁড়ালো– পুরো বই মনোযোগ সহকারে পড়ে তবেই লেখকের বা উপস্থাপিত তথ্যের দিকনির্দেশনা, উদ্দেশ্য, বিশেষত লেখক কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বইটি লিখেছেন– তা বুঝতে

হয়। একই নীতি ‘বেলায়তে মোত্লাকা’ কিতাবটির ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। কীভাবে– আশা করি তা পুরো প্রবন্ধে উঠে দাঁড়াবে।

“(বেলায়তে মোত্লাকা) বিধান ধর্ম ও রীতিনীতি বা রেওয়াজ হতে খোদার ইচ্ছা শক্তিকে অধিকতর প্রাধান্য দেয়” কথাটি ‘বেলায়তে মোত্লাকা’ কিতাবে কেন বলা হয়েছে, দুটি বাস্তবতা বা প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রাখলে তা পাঠক মনে আয়নায় নিজের চেহারা দর্শনের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে। অর্থাৎ, ‘বেলায়তে মোত্লাকা’ কিতাবে কথাটি বলার কারণকে মোটাদাগে দু’ভাগে ভাগ করা যায়– **এক.** কুরআনীয় বাস্তবতা, **দুই.** চলমান বাস্তবতা।

সম্মানিত পাঠক মহলের জ্ঞাতার্থে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোকপাত করা প্রাসঙ্গিক মনে করছি–

এক. কুরআনীয় বাস্তবতা: কুরআনীয় বাস্তবতার অর্থ হলো, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনা-প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে দেখা যায় চলমান সময়ের বিধান ধর্ম থাকলেও বিশেষ কারণবশত বিশেষ ক্ষেত্রে মহান রাব্বুল আলামিনের ইচ্ছা শক্তিই প্রাধান্য পায়। কারণ বিধান ধর্মও তো তাঁর ইচ্ছা শক্তির অনুকূলে, তাঁর ইচ্ছা শক্তির অধীন। তাই নয় কি? প্রসঙ্গক্রমে একটি উদাহরণ দেওয়া যায়, আল্ কুরআনের সূরা কাহাফের ৬০-৮২ নম্বর আয়াতে করিমায় হযরত মুসা (আ.) ও হযরত খিযির (আ.)’র একটি ঘটনা তুলে ধরেছেন মহান রাব্বুল আলামিন স্বয়ং। যেখানে হযরত খিযির (আ.) এমন তিনটি কাজ করেছেন যা বিধান ধর্ম ও রীতিনীতি মতে বা আপাতদৃষ্টিতে আপত্তিকর মনে হলেও মূলত তিনটি কাজেই মহান রাব্বুল আলামিনের ইচ্ছা শক্তিরই প্রতিফলন ঘটেছে। এমনকি আল্ কুরআনও ঘটনা তিনটির পক্ষেই সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করেছে। অতএব প্রমাণিত যে, বিশেষ কারণবশত বিশেষ ক্ষেত্রে বিধান ধর্ম ও রীতিনীতির তুলনায় মহান রাব্বুল আলামিনের ইচ্ছা শক্তিই প্রাধান্য পায়। পরন্তু এখানে সুস্পষ্টভাবে বলেই দেওয়া হয়েছে, وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا অর্থ: “(হযরত খিযির আ. বলছেন– হে মুসা) আপনি এমন বিষয়ে কীভাবে ধৈর্যধারণ করবেন যে বিষয়ে আপনার অবগতি নেই?” [সূরা কাহাফ: ৬৮]। এখানে দুটো বিষয় সুস্পষ্ট– প্রথমত, হযরত মুসা (আ.)’র বিধান ধর্ম ও রীতিনীতির অবস্থান এক পর্যায়ের এবং মহান রাব্বুল আলামিনের ইচ্ছা শক্তির

প্রতিফলনে সংঘটিত হযরত খিযির (আ.)'র ঘটনা প্রবাহ সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যায়ের। দ্বিতীয়ত, বিধান ধর্ম ও রীতিনীতি হলো, দুনিয়ায় মানব সভ্যতা সুষ্ঠুভাবে, ভারসাম্যপূর্ণভাবে টিকে থাকার জন্য একটি শৃঙ্খলা বিধান– 'যা বিশেষ কারণবশত বিশেষ ক্ষেত্রে মহান রাব্বুল আলামিনের প্রতিফলিত ইচ্ছা শক্তিকে' বাধা প্রদান করে না বরং পথ ছেড়ে দেয়। কারণ সর্বমূলে সর্বময় ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিপতি বা মালিক তো তিনিই। সৃষ্টিজগতে যা-ই হোক না কেন, সবই তাঁর ইচ্ছা শক্তিতেই হবে। বান্দা তা স্বীকার করে নিল কী অস্বীকার বা কুফরী করলো এসবের মুখাপেক্ষী তিনি নন। বরং তিনি এসব থেকে সম্পূর্ণভাবে পূতপবিত্র। এটি অস্বীকার করা মানে তাঁর সর্বময় ক্ষমতাকে অস্বীকার করা। যা শিরক ও কুফরের পর্যায়ে চলে যায়। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে নাস্তিক্যবাদের পর্যায়ে গিয়ে ঠেকে।

দুই. চলমান বাস্তবতাঃ মহান রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এমন একটি জীবন-বিধান (ইসলাম) দিয়েছেন যা 'সময়ের নৈতিক চাহিদা' অনুযায়ী সব ধরনের পরিবেশ-প্রতিবেশ-পরিস্থিতির জন্য সমানতালে প্রযোজ্য। কারণ তিনি এ জীবন-বিধানকে এমনভাবে সন্নিবেশিত করেছেন যে, এতে মানবজীবনের যাবতীয় সমস্যা, প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য মূল সূত্রগুলো দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেগুলোকে মূলভিত্তি হিসেবে নিয়েই যুগে যুগে সময়ের নৈতিক চাহিদা অনুযায়ী 'সংস্কারের মাধ্যমে' এর অনুসারীরা আলোর পথ খুঁজে নেবে। আর সংস্কারের ক্ষেত্রে ইসলাম দুটি পদ্ধতি দিয়ে রেখেছে। এর একটি হলো 'তাজদিদ' এবং অপরটি হলো 'ইজতিহাদ'। তাজদিদ হলো, মহান রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে প্রতি শতাব্দী বা একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর একজন মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) নিযুক্ত থাকবেন। যিনি ইসলামের মূল বিধি-নিষেধের সাথে চলমান পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে দেবেন। আর ইজতিহাদ মানে হলো, গবেষণা, পর্যালোচনা, নিরপেক্ষ প্রামাণিক বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সময়োপযোগী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। অর্থাৎ ইসলামের মূলসূত্রের সাথে যুগের পরিস্থিতিকে নিয়ে ভারসাম্যপূর্ণভাবে ফিক্‌হ-নীতি প্রণয়ন করা, যাতে যুগোপযোগিভাবে ইসলামের অনুসরণ করা যায়। যেমন, সূরা হজ্জের ২৭ নম্বর আয়াতে করিমায় মহান রাব্বুল আলামিন বান্দাকে নির্দেশ দিয়েছেন 'তারা যেন পায়ে হেঁটে এবং উটের পিঠে চড়ে হজ আদায় করতে রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র দরবারে আসে'। কিন্তু

একটিবার ভাবুন তো– আজকের যুগে তা কি সম্ভব? অর্থাৎ চলমান সময়ের নৈতিক চাহিদার সাথে খাপ খাইয়ে নীতি প্রণয়ন করে নিতে হবে। মূলকথায় আসা যাক, ইসলামের মূল সূত্রগুলো সময়ের নৈতিক চাহিদার আলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে নেওয়ার পুরোপুরি বিধান ইসলামে দেওয়া থাকলেও তা আজ এভাবে প্রণীত নয়। বৈশ্বিকভাবে যুগোপযোগী ফৎওয়ার কিতাব প্রণীত নেই। জীবনের তাগিদে কিছু কিছু জায়গায় নিজেদেরকে মানিয়ে নিয়েছি মাত্র। তাই আজ আমরা পদে পদে বাধার শিকার। আমরা আজও কয়েক শতাব্দী আগের ফৎওয়ার কিতাব দিয়ে সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে ফিরি। উল্লেখ্য, সেগুলো তৎকালের জন্য শত-শতাংশ প্রযোজ্য ছিল বটে। এমনকি আজকের সময় যদি তখনকার সময়ের তুলনায় বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না হতো তাহলে সেগুলো আজকের জন্যও পরিপূর্ণভাবে অনুসরণীয় হতো।

এমতাবস্থায় একজন যুগের ইমাম বা সাহেবে কশ্‌ফ অলিউল্লাহ্ তো বহু ঊর্ধ্বের কথা, উপর্যুক্ত কারণে একজন গবেষক বা দার্শনিকের পক্ষেও শত শত বছর আগে প্রণীত ফিক্‌হ-পদ্ধতিকে 'পুরোপুরি' সাথে নিয়ে কর্ম পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ছে। মূলত বেলায়তে মোত্‌লাকা বিধান ধর্ম ও রীতিনীতি বা রেওয়াজ হতে খোদার ইচ্ছা শক্তিকে অধিকতর প্রাধান্য দেওয়ার পেছনে এটা একটা বড় কারণ। তাই 'বেলায়তে মোত্‌লাকা' কিতাবে বর্ণিত বিষয়গুলোর ব্যাপারে একান্ত নিজের বুঝ-ব্যবস্থা বা অপরিণত মাইন্ডসেটের মাধ্যমে ধোঁয়াশা, ভিত্তিহীন কিছু একটা ধরে না নিয়ে কিতাবটি পুরোপুরি অনুধাবন করে পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করলে তবেই আলো পাবেন সত্য অনুসন্ধানী পাঠক।

সূরা আদ্ব দ্বোহার চতুর্থ আয়াত 'ওয়ালাল আখেরাতু খাইরুল লাকা মিনাল উলা' এর মর্মার্থ

[বেলায়তে মোত্‌লাকা: পৃষ্ঠা- ২৪, তৃতীয় প্রকাশের পুনঃপ্রকাশ]

পবিত্র কুরআন আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র নিকট আসা ওহিয়ে মাতলুর সমন্বিত রূপ। কুরআনের আয়াত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শানে নুজুল গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কুরআনের আয়াতের প্রাসঙ্গিকতা শুধুমাত্র শানে নুজুলের মাধ্যমেই ফুরিয়ে যায় না। কুরআনের প্রতিটি আয়াত চির-আধুনিক। পৃথিবীর প্রতিটি ঘটনার মাঝেই পবিত্র কুরআনের কোন না কোন আয়াতের প্রাসঙ্গিকতা জড়িয়ে আছে। পবিত্র কুরআনের ভাষায়– "তিব্ইয়ানাল লিকুল্লি শাইয়ি"। অর্থাৎ সব বিষয়ের বর্ণনাই এতে রয়েছে। পবিত্র কুরআনের জাহেরী (আক্ষরিক) অর্থ যতটা মাহাত্ম্যপূর্ণ, এর বাতেনী (অন্তর্নিহিত) অর্থ তার চেয়েও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ-নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ। ডুবুরী সমুদ্রের যত গভীরে যায় ততই মূল্যবান মণি-মাণিক্যের সন্ধান পেয়ে থাকে। একইভাবে খোদায়ী জ্ঞানে যাঁর অন্তর যত বেশি ভরপুর তিনি খোদার কালামের যে ব্যাখ্যা করবেন তা তত বেশি গভীর পর্যবেক্ষণমূলক হবে– সেটাই স্বাভাবিক। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, কুরআন পাঠের ক্ষেত্রে একজন সুফি এবং একজন ফকিহ্‌র দৃষ্টিভঙ্গি সব ক্ষেত্রে একই হয় না। অর্থাৎ কুরআনের একটি আয়াতকে একজন ফকিহ্ যেই দৃষ্টিকোণে দেখেন, একজন সুফি সবসময় সেই একই দৃষ্টিকোণে দেখেন না। তাই উভয়ের বিশ্লেষণের মাঝেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এ জন্য সুফিয়ানা কোন কিতাবে বর্ণিত কুরআনের কোন আয়াতের বিশ্লেষণ সুফিয়ানা ভঙ্গিতে হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই

একজন সচেতন পাঠক সুফিয়ানা কিতাবে বর্ণিত কুরআনের কোন আয়াতের বিশ্লেষণ পাঠ করার কালে সুফিয়ানা দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনায় রেখে তা বিচার করেন। বেলায়তে মোত্‌লাকা গ্রন্থের সম্মানিত গ্রন্থকার খাদেমুল ফোক্বারা অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) হলেন গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র মনোনীত সাজ্জাদানশীন, অছি তথা উত্তরাধিকারী, সর্বজন স্বীকৃত সুফি এবং কশ্‌ফের অধিকারী মহান অলি আল্লাহ্। বেলায়তে মোত্‌লাকা গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে সূরা আদ্ব দ্বোহার চতুর্থ আয়াতের অর্থ বর্ণনা করে উক্ত আয়াতের অন্তর্নিহিত মর্মার্থ উল্লেখ করে তিনি বলেন– 'ইহা দীর্ঘ বেলায়ত যুগের সুসংবাদ'। সূরা আদ্ব দ্বোহার চতুর্থ আয়াতের এ মর্মার্থটি তাঁর কশ্‌ফজনিত উপলব্ধির স্বাধীন প্রকাশ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। মমতাজুল মোহাদ্দেসীন মাওলানা ওবাইদুল আকবর বলেন– 'ভাবধারার দিক দিয়া এ গ্রন্থে শাইখে আকবর হযরত মুহিউদ্দিন ইবনু আরাবী (রহ.) রচিত এলমে লদুন্নী এলহাম মুকাশেফা সমৃদ্ধ ফসুসুল হেকম নামক কেতাব ও মসনবিয়ে রূমী প্রভৃতি তাসাওউফের উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কেতাবাদী অনুসৃত হইয়াছে। স্থানে স্থানে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মতামত ব্যক্ত করা হইয়াছে'। পরন্তু পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে কুরআনের আয়াত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ফিক্‌হী এবং সুফি দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে কোন কোন সময় ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। কাজেই অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী একজন সুফি হিসেবে সূরা আদ্ব দ্বোহার চতুর্থ আয়াতের মর্মার্থে যা উল্লেখ করেছেন তা তাঁর কশ্‌ফজনিত একটি উপলব্ধি হিসেবেই বিবেচনায় নিতে হবে।

অধিকন্তু পূর্ববর্তী নবি রাসুলগণের তুলনায় রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র বেলায়ত যুগ দীর্ঘ। রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র বেলায়ত যুগের এই দীর্ঘতা মূলত রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র বেলায়তের উত্তরাধিকারী আউলিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমেই কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র তিরোধানের প্রায় পাঁচশত বছর পর রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র মোহাম্মদ নামের সত্তায় বিকশিত বেলায়তের উত্তরাধীকারী গাউসুল আযম শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী (ক.)'র মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় হাবিবের বেলায়তী যুগকে দীর্ঘায়িত করেন। তারও প্রায় পাঁচ শতাধিক বছর পর রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র আহমদ নামের সত্তায় বিকশিত বেলায়তের উত্তরাধিকারী

গাউসুল আযম শায়খ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় হাবিবের বেলায়তি যুগকে আরও দীর্ঘায়িত করেন। এই বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেই বেলায়তে মোত্লাকার সম্মানিত গ্রন্থকার বেলায়তে মোকাইয়াদা এবং বেলায়তে মোত্লাকা যুগের আলোচনার পর তাসাওউফের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে প্রাসঙ্গিক বিধায় "ওয়ালাল আখেরাতু খাইরুল লাকা মিনাল উলা" আয়াতটির অর্থ উল্লেখ করেছেন। তবে আয়াতটির শুধুমাত্র আক্ষরিক অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বিষয়টি দুর্বোধ্য মনে হতে পারে, কিন্তু এর পরের অংশ "ইহা দীর্ঘ বেলায়ত যুগের সুসংবাদ" এর প্রতি লক্ষ্যপাত করলেই বিষয়টি যে সুফিয়ানা একটি দৃষ্টিভঙ্গি তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে পড়ে। অনেকেই লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতা সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা না করে অভিযোগ তোলেন– 'বেলায়তে মোতলাকা গ্রন্থে দাবী করা হয়েছে সূরা আদ দোহার চতুর্থ আয়াতটি গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর শানে নাজিল হয়েছে'। তাঁদের এই অভিযোগটি মূলত অসত্য, মনগড়া এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। বেলায়তে মোত্লাকা গ্রন্থের কোথাও এই আয়াতটি হুযুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর শানে নাজিল হয়েছে এমন উদ্ভট দাবী উপস্থাপন করা হয়নি। মূলত বেলায়তে মোত্লাকায় উল্লেখ করা হয়েছে– "কোরানে পাকের সূরা অদ্দোহার ৪র্থ আয়াতে বর্ণিত আছে 'তোমার শেষ প্রথম হইতে উত্তম'। ইহা দীর্ঘ বেলায়ত যুগের সুসংবাদ"।

‘আন্তা ফিহিম’-এর ব্যাখ্যা

[বেলায়তে মোত্‌লাকা: পৃষ্ঠা- ১৩৫, তৃতীয় প্রকাশের পুনঃপ্রকাশ]

বেলায়তে মোত্‌লাকা গ্রন্থের দ্বাদশ পরিচ্ছেদের শেষ অংশে উল্লেখ আছে– “তুমি রসুলুল্লাহের উত্তরাধিকারী অগ্রনায়ক হিসাবে উপস্থিত না থাকিলে কেহই বাঁচিতে পারিবে না। তোমার উপস্থিতিই খোদার রহমত। ইহার সাক্ষী পবিত্র কুরআন– ‘আন্তা ফিহীম’।” প্রথমেই ধারণায় রাখতে হবে যে, বেলায়তে মোত্‌লাকা তাসাওউফের অতি উচ্চমার্গীয় একটি কিতাব। এই কিতাবের সম্মানিত লেখকও একজন অতি উঁচু স্তরের সুফি ব্যক্তিত্ব। সুফিদের কথা এবং লেখা বেশির ভাগ সময় রহস্যপূর্ণ, রূপক ও ব্যঞ্জনাময় হয়। তাঁদের সংক্ষিপ্ত কোন উক্তিতে যে রহস্য, ইঙ্গিত এবং নিগূঢ়তা লুক্কায়িত থাকে তা গভীর উপলব্ধির মাধ্যমেই বুঝে নিতে হয়। সুফিদের তাৎপর্যপূর্ণ কথামালা উপলব্ধির ক্ষেত্রে সৎচিন্তা এবং তাঁদের প্রতি পবিত্র ধারণা রাখা একান্ত জরুরী। অসৎ উদ্দেশ্য কিংবা নেতিবাচক ধারণা নিয়ে কেউ যদি সুফিয়ায়ে কেরামের কোন কিতাব কিংবা সুফিদের জীবন দর্শন অধ্যয়ন করে তবে সে কখনোই প্রকৃত মর্মের নিকটে পৌঁছাতে পারবে না। সুতরাং বেলায়তে মোত্‌লাকা পাঠের ক্ষেত্রে কিংবা এই কিতাবের কোন বিষয়ের মর্ম উপলব্ধির ক্ষেত্রে পক্ষপাতদুষ্ট নীতি পরিহার করা উচিত। এবার মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। আল্লাহ্‌র আউলিয়ায়ে কেরামের উপস্থিতিতে মানুষের অন্তর স্রষ্টা প্রেমে উদ্বেলিত হয়। তাঁদের সোহবতের মাধ্যমে মানুষ সিরাতুল মোস্তাকিমের পথে অবিচল থাকে, হক্কুল্লাহ্‌ ও হক্কুল ইবাদের প্রতি যত্নবান হয় এবং অন্তরে খোদায়ী প্রেরণা-হাল-জয্‌বার উন্মেষ ঘটে। তাই আউলিয়ায়ে কেরাম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক বিশেষ রহমত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ পাক পবিত্র কুরআনে বলেন– اِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ অর্থ: “নিশ্চয় আল্লাহ্‌র করুণা সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী” [সূরা আরাফ: আয়াতাংশ-৫৬]। গাউসুল আযম

হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) হলেন বেলায়তের সর্বোচ্চ মকাম 'বেলায়তে ওজমা'র অধিকারী মহান অলি আল্লাহ্। রাসুলে পাক (দ.) যে মহান দুজন সত্তাকে বেলায়তের তাজ পরিধানের মাধ্যমে অতি মর্যাদাপূর্ণ আসনে সমাসীন করেছেন তাঁদেরই একজন হলেন হুযুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)। এ বিষয়ে ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা আযিযুল হক শেরে বাংলা (র.)ও বলেন– "তা-জ দো বূ-দাহ বদস্তে সরওয়ারে পয়্গাম্বরাঁ, এক নেহাদাহ বর সরে শাহ্ আহমদ উল্লাহ্ বে গুমাঁ" – **অর্থঃ** "রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র নিকট বেলায়তে ওজমা বা শ্রেষ্ঠ বেলায়তের দুইটি সম্মান প্রতীক বা তাজ ছিল (যা বেলায়তে মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদী ও বেলায়তে মোত্লাকায়ে আহমদী বলে বুঝা যায়), এই সম্মান প্রতীক বা তাজ দুইটির মধ্যে একটি হযরত আহমদ উল্লাহ্ (ক.)'র মস্তক মোবারকে নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত।" সুতরাং স্বয়ং রাসুলে করিম (দ.) কর্তৃক বেলায়তে ওজমার তাজের অধিকারী হয়ে তাঁর যুগশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারের মর্যাদায় যিনি অভিষিক্ত হয়েছেন তাঁর উপস্থিতি নিঃসন্দেহে খোদার পক্ষ থেকে এক বিরাট রহমত।

আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন– وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ অর্থ: "আল্লাহ্ তায়ালা এমন নন যে, আপনি তাদের মধ্যে থাকবেন অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন" [সূরা আনফাল: আয়াতাংশ-৩৩]। অর্থাৎ যেহেতু রাসুলুল্লাহ্ (দ.)-কে আল্লাহ্ পাক "রাহমাতুল্লিল আলামিন" হিসেবে প্রেরণ করেছেন সেহেতু আল্লাহ্ পাক রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র উপস্থিতিতে কখনো পৃথিবীতে আযাব দিবেন না। আর রাহমাতুল্লিল আলামিন রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র রহমতের করুণাধারা বেলায়তপ্রাপ্ত আল্লাহ্র আউলিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমেই কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। তাই আল্লাহ্র আউলিয়ায়ে কেরাম যেখানে অবস্থান গ্রহণ করেন সেই স্থান আল্লাহ্র রহমতের চাদরে আচ্ছাদিত থাকে। আর যেহেতু হুযুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী স্বয়ং রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র পক্ষ থেকে বেলায়তে মোত্লাকায়ে আহমদীর তাজপ্রাপ্ত হয়ে বেলায়তে মোত্লাকায়ে আহমদী যুগের অগ্রনায়কের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত, সুতরাং তাঁর উপস্থিতি জগৎবাসীর জন্য রহমত স্বরূপই বটে। এই বিষয়টি বুঝানোর জন্যই বেলায়তে মোত্লাকায় উল্লেখ করা হয়েছে– "তোমার উপস্থিতিই খোদার রহমত। ইহার সাক্ষী পবিত্র কুরআন– 'আন্তা ফিহীম'।" অর্থাৎ আল্লাহ্র

আউলিয়ায়ে কেরাম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য নেয়ামত স্বরূপ। তাঁদের জাহেরী উপস্থিতি যেভাবে আল্লাহ্‌র করুণা প্রাপ্তির উপলক্ষ্য, একইভাবে তাঁরা যে স্থানে মাযার পাকে অবস্থান গ্রহন করেন তাও আল্লাহ্‌র করুণাধারা প্রাপ্তির স্থল হিসেবে পরিগণিত। এরই আলোকে যেহেতু হুযুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সাধারণ অলি নন, বরং রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র পক্ষ থেকে বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহমদীর তাজপ্রাপ্ত হয়ে উক্ত যুগের অগ্রনায়কের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত, সুতরাং তাঁর উপস্থিতি সমগ্র মানব জাতির জন্য বিশেষ রহমত স্বরূপ। কেননা তাঁর প্রদর্শিত দর্শনের মধ্যে অশান্তিমুক্ত বিশ্ব বিনির্মাণের পথ-নির্দেশিকা রয়েছে। বেলায়তে মোত্‌লাকা কিতাবে মূলত উক্ত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই এই আয়াতটির অবতারণা করা হয়েছে।

কোন ত্বরিকার খেলাফত প্রাপ্ত হওয়ার পর স্বতন্ত্র ত্বরিকা প্রতিষ্ঠার বাস্তবতা

'ত্বরিকা' শব্দটি তাসাওউফ জগতের গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিভাষা। এর আভিধানিক অর্থ– পথ, পদ্ধতি, রাস্তা, রীতি, মত ইত্যাদি। ত্বরিকার পারিভাষিক সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আল্লামা জুরজানী (র.) বলেন– 'আল্লাহ্‌র পথের অনুসারীদের বিভিন্ন মানজিল অতিক্রম করে উঁচু স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য যে বিশেষ রীতি-পদ্ধতি তাই হলো ত্বরিকা'।

কুরআন এবং হাদিসে ত্বরিকার সুনির্দিষ্ট কোন আকার, আকৃতি, রূপরেখা গ্রন্থিত এবং সুবিন্যস্ত আকারে বর্ণিত নেই। মূলত খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনকাল অতিবাহিত হওয়ার পর মুসলিম রাষ্ট্র পরিচালনা অনেকাংশেই রুহানিয়্যত শূন্য হয়ে পড়ে। এরূপ অবস্থায় সুফিয়ায়ে কেরাম মানুষের মাঝে ইসলামের রূহানী চেতনা বিকাশের জন্য বিভিন্ন খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন। হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ্ পাক বলেন– 'বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমেই আমার নৈকট্য লাভ করে'। তাই সুফিয়ায়ে কেরাম ইসলামের ফরজ নীতি-বিধানের সাথে সাথে আরো কিছু নফল নীতি-বিধান নিজেদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় করে নেন এবং তাঁদের অনুসারীদের জন্যও চর্চার-অনুশীলনের বিষয়বস্তুতে পরিণত করেন। তাবেঈন যুগে কোন কোন সুফিয়ায়ে কেরামের চর্চিত বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্য সংখ্যক একটি গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করতে থাকে এবং সময়ের পরিক্রমায় ক্রমান্বয়ে তা সুনির্দিষ্ট উসূলে পরিণত হওয়ার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক আকার লাভ করে। এভাবেই মূলত ত্বরিকার উৎপত্তি ঘটে। পৃথিবীতে অসংখ্য ত্বরিকা রয়েছে। অনেকেই মনে করেন– ত্বরিকার ইতিহাসে কাদেরিয়া ত্বরিকা-ই প্রথম। কিন্তু বাস্তব তথ্য হল তাবেঈন যুগ থেকেই ত্বরিকার অস্তিত্ব পরিদৃশ্যমান। হযরত

ওয়ায়েস করনী (র.)'র 'ওয়াইসিয়া ত্বরিকা', হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র.)'র 'তাইফুরিয়া ত্বরিকা' তাবেঈন যুগে ত্বরিকার অস্তিত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আবার অনেকেই মনে করেন– তাসাওউফ জগতে ত্বরিকা রয়েছে শুধু চারটি। এরূপ ধারণা তাসাওউফ জগত সম্পর্কে সীমাবদ্ধ জ্ঞান থেকেই আসে। ত্বরিকার ইতিহাস থেকেই জানা যায়– পৃথিবীতে অসংখ্য ত্বরিকার অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে। বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত 'ইসলামী বিশ্বকোষ'-এ ১৮০টি ত্বরিকার নামের তথ্য পাওয়া যায়। ওয়াইসিয়া, তাইফুরিয়া, মৌলবিয়া, শাজিলিয়া, কলন্দরীয়া, রেফাইয়া, তিজানিয়া ইত্যাদি আরও অসংখ্য ত্বরিকার অনুসারী এখনো বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং চার ত্বরিকার ধারণাটি অমূলক, অশুদ্ধ এবং অবাস্তব।

কাদেরিয়া ত্বরিকার খেলাফত পাওয়ার পর স্বতন্ত্র ত্বরিকা প্রতিষ্ঠা করার বাস্তবতাঃ পৃথিবীতে যত ত্বরিকতের ইমাম আছেন তাঁরা সকলেই পূর্ববর্তী কোন না কোন ত্বরিকার শায়খের হাতে বায়াত গ্রহণ করেছেন। যেমন হযরত গাউসুল আযম শায়খ সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (ক.) জুনাইদিয়া ত্বরিকার মুরাদ ছিলেন। তিনি জুনাইদিয়া ত্বরিকার শায়খ হযরত আবু সাঈদ মাখজুমী (র.)'র নিকট বায়াত গ্রহণের মাধ্যমে খেলাফত অর্জন করেন এবং পরবর্তীতে তিনি স্বতন্ত্র একটি ত্বরিকা প্রবর্তন করেন, যার নাম "কাদেরিয়া ত্বরিকা"। আবার কাদেরিয়া ত্বরিকার খেলাফত প্রাপ্ত হয়ে হযরত শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী 'সোহরাওয়ার্দীয়া ত্বরিকা'র প্রবর্তন করেন। একইভাবে হুযুর গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.) ছিলেন কাদেরিয়া ত্বরিকার মুরাদ। তিনি কাদেরিয়া ত্বরিকার শায়খ হযরত আবু শাহমা সালেহ লাহুরী (ক.)'র হাতে বায়াত গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে স্বতন্ত্র একটি ত্বরিকা প্রবর্তন করেন, যার নাম "ত্বরিকায়ে মাইজভাণ্ডারীয়া"। সুতরাং এক ত্বরিকা থেকে অপর ত্বরিকা উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠার বাস্তবতা ইতিহাস সিদ্ধ একটি ব্যাপার। উপরন্তু এই বাস্তবতা যদি না থাকত তবে পৃথিবীতে এতগুলো ত্বরিকার উদ্ভব ঘটত না।

ত্বরিকার নামঃ পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে অসংখ্য ত্বরিকার অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে। বিদ্যমান ত্বরিকাগুলো বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ। ত্বরিকার নামকরণের ক্ষেত্রে কোন কোন ত্বরিকার নাম ত্বরিকা প্রবর্তকের নামের আলোকে

হয়ে থাকে। যেমন সুপ্রসিদ্ধ জুনাইদিয়া ত্বরিকা হযরত জুনাইদ বাগদাদী (র.)'র নামানুসারে, সুপ্রসিদ্ধ কাদেরিয়া ত্বরিকা গাউসুল আযম শায়খ সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (ক.)'র নামানুসারে। আবার কোন কোন ত্বরিকার নাম ত্বরিকা প্রবর্তক যেখানে অবস্থান করেন সেই স্থানের নাম অনুসারে হয়ে থাকে। যেমন হযরত বায়েজিদ বোস্তামীর অবস্থিতি তাইফুর অঞ্চলের নামানুসারে তাঁর ত্বরিকার নাম "তাইফুরিয়া ত্বরিকা", চিশ্‌তিয়া ত্বরিকার প্রবর্তক হযরত আবু ইসহাক শামী (র.)'র অবস্থানস্থল 'চিশ্‌ত' শহরের নামানুসারেই চিশ্‌তিয়া ত্বরিকার নাম প্রসিদ্ধি লাভ করে। এরই আলোকে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্‌ (ক.)'র অবস্থানস্থল মাইজভাণ্ডার গ্রামের নামানুসারেই এই ত্বরিকার নাম জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সুতরাং ত্বরিকা প্রবর্তকের নামানুসারেই ত্বরিকার নাম হতে হবে এরূপ ধারণা করা মূলত জ্ঞানগত সীমাবদ্ধতার পরিচায়ক।

খাতেমুল আউলিয়ার সুসংবাদ

[বেলায়তে মোত্লাকাঃ পৃষ্ঠা- ৩০, তৃতীয় প্রকাশের পুনঃপ্রকাশ]

রাসুলে আকরাম (দ.) হলেন আখেরী নবি, খাতেমুন নবিঈন। তাঁর আগমনের মাধ্যমে নবুয়তের দরজা বন্ধ ঘোষিত হয়। রাসুলে আকরাম (দ.) শুভ জন্মগ্রহণ করেন ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে। আর শায়খুল আকবর মুহিউদ্দীন ইবনু আরাবী (র.) শুভ জন্মগ্রহণ করেন ১১৬৬ খ্রিষ্টাব্দে। অর্থাৎ রাসুলে আকরাম (দ.)'র শুভ জন্মের প্রায় ৫৯৬ বছর পরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর পরিণত বয়সে তিনি 'ফুসুসুল হিকাম' নামক বিখ্যাত কিতাবটি লিপিবদ্ধ করেন। শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনু আরাবী ফুসুসুল হিকাম কিতাবে খাতেমুল আউলিয়া যে জন্মগ্রহণ করবেন সে ব্যাপারে ভবিষ্যতবাণী করেন। সুতরাং একটি বিষয় স্পষ্ট যে, যিনি খাতেমুল আউলিয়া হবেন তিনি শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনু আরাবীরও অনেক পরে জন্মগ্রহণ করবেন। এমতাবস্থায় কেউ যদি রাসুলুল্লাহ্ (দ.)-কে খাতেমুল আউলিয়া ধরে নেন কিংবা প্রমাণ করতে চান তবে তা হবে ফুসুসুল হিকাম গ্রন্থের বিকৃত ব্যাখ্যা। একজন সাধারণ ব্যক্তির মস্তিষ্কেও বুঝে আসবে যে– রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র জন্মের প্রায় ৫৯৬ বছর পর জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তি কখনো রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র আগমনের ভবিষ্যতবাণী, সুসংবাদ প্রদান করতে পারেন না। কারণ ভবিতব্য কোন বিষয়ে ভবিষ্যতবাণী বা সুসংবাদ প্রদান করা যায়, ঘটিত বিষয়ে নয়। সুতরাং রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র শুভ জন্মের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য কাউকে অবশ্যই রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র জন্মের আগে পৃথিবীতে আসতে হবে। যেভাবে হযরত ঈসা (আ.) রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র আগমনের সুসংবাদ প্রদান করেছেন এবং তা পবিত্র

কুরআনেও বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও ফুসুসুল হিকাম গ্রন্থের ৬৪ পৃষ্ঠায় আরও উল্লেখ আছে– خاتم الاولياء الولي الوارث **অর্থ:** "খাতেমুল আউলিয়া রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র অলিয়ে ওয়ারিস হবেন।" এ থেকেও স্পষ্ট যে, খাতেমুল আউলিয়া হলেন রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র ওয়ারিস। সুতরাং ফুসুসুল হিকাম গ্রন্থের পূর্বাপর বর্ণনা এবং মর্মার্থ উপলব্ধি না করে রাসুলুল্লাহ্ (দ.)কে খাতেমুল আউলিয়ার স্তরে নামিয়ে আনলে তা হবে রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র শান-আযমত খাটো করার শামিল।

খাতেমুল আউলিয়া

(অব্যবহিত পূর্বে বোনের জন্ম প্রসঙ্গ)

[বেলায়তে মোত্লাকা: পৃষ্ঠা- ৩১, তৃতীয় প্রকাশের পুনঃপ্রকাশ]

তাসাওউফ পরিমণ্ডলে হযরত শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনু আরাবী (র.) অত্যন্ত পরিচিত এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তাঁকে শায়খুল আকবর অভিধায় সম্বোধন করা হয়। তাঁর লিখিত সুপ্রসিদ্ধ একটি কিতাব হলো– ফুসুসুল হিকাম। এই গুরুত্বপূর্ণ কিতাবে খাতেমুল আউলিয়া প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা বর্ণিত হয়েছে। খাতেমুল আউলিয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন–

و على قدم شيث يكون آخر مولود يولد من هذا النوع الإنسانى ، وهو حامل أسراره ، وليس بعده ولد في هذا النوع ، فهو خاتم الأولاد ، وتولد معه أخت له فتخرج قبله ويخرج بعدها يكون رأسه عند رجليها ، ويكون مولده بالصين ولغته لغة أهل بلده . ويسري العقم في الرجال والنساء فيكثر النكاح من غير ولادة ويدعوهم إلى الله فلا يجاب . فإذا قبضه الله تعالى وقبض مؤمني زمانه بقي من بقي مثل البهائم لا يحلون حلالاً ولا يحرمون حراما ، يتصرفون بحكم الطبيعة شهوة مجـردة عن العقل والشرع فعليهم تقوم الساعة

অনুবাদ: “মানব জাতির মধ্যে হযরত শীশ (আ.)’র অনুসারী ও তাঁর ভেদাভেদের ধারক ও বাহক এক ছেলে ভূমিষ্ঠ হবেন। তাঁর পর এরূপ মর্যাদাসম্পন্ন কোন ছেলে জন্মগ্রহণ করবেন না। তিনি খাতেমুল আওলাদ বা

অলদ হবেন। তাঁর সাথে তাঁর এক বোনের জন্ম হবে। বোনটি আগে জন্ম নিবে, পরে তিনি জন্মগ্রহণ করবেন। তাঁর মাথা বোনের পায়ের নিকটবর্তী থাকবে। (অর্থাৎ এই ছেলের অব্যবহিত পূর্বে তাঁর এক বোন জন্মগ্রহণ করবেন) তাঁর জন্ম চীন প্রান্তে হবে (চীন বলতে বর্তমানে যে চীন দেশ রয়েছে তা ধরে নিলে ভুল হবে। কারণ শায়খ মুহিউদ্দিন ইবনু আরাবী যখন এই গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন তখন বর্তমান বিশ্বের মত সীমানাভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল না। বরং সাম্রাজ্য ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা ছিল। সুতরাং চীন বলতে তৎসময়ে চীনাদের মাধ্যমে যে সকল অঞ্চল শাসিত হত সে সকল অঞ্চলকে বুঝে নিতে হবে। আর ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়, প্রাচীন চট্টগ্রাম তৎসময়ে চীনা অধ্যুষিত ছিল। পরন্তু এর বাস্তবতা হল বর্তমান সময়ে চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে চীনা বংশোদ্ভূতদের উপস্থিতি)। তাঁর ভাষা সেই নগরের ভাষা হবে। অতঃপর নর-নারীর মধ্যে বন্ধ্যারোগ সংক্রমিত হবে। জনন-প্রজনন ব্যতীত বিবাহের আধিক্য হবে। মানব জাতিকে তিনি আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানাবেন কিন্তু সন্তোষজনক সাড়া পাওয়া যাবে না। এবং সেই যুগের মুমিনদের তিরোধানের পর মানব স্বভাব চতুষ্পদ জন্তুর স্বভাবে পরিণত হবে। হালাল হারাম পরিচয় করবে না। ধর্ম ও বিবেচনা হতে দূরে সরে গিয়ে প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির নির্দেশে কামস্পৃহা চরিতার্থ করতে মশগুল থাকবে। অতঃপর তাদের উপর কেয়ামত সংঘটিত হবে।"

[সূত্রঃ ফুসুসুল হিকাম, পৃষ্ঠাঃ ৬৭, দ্রঃ স্ক্যান নং-১৮]

ফুসুসুল হিকাম গ্রন্থের এই উদ্ধৃতির আলোকে খাতেমুল আউলিয়ার একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁর জন্মের পূর্বে তাঁর এক বোনের জন্ম হবে। বোনের শুভ জন্মের ব্যাপারে বর্ণনা দিতে গিয়ে ইবনু আরাবী (র.) আরবিতে **مع** "মা'আ" শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আভিধানিকভাবে মা'আ শব্দের অর্থ– 'সাথে'। আরবি ভাষা হলো খুবই সমৃদ্ধ ও স্থান-কাল-পাত্রভেদে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অর্থ দিতে সমর্থ এমন একটি ভাষা। ফলে মা'আ শব্দটির অর্থ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও একটি ব্যঞ্জনা পরিলক্ষিত হয়। যেমন– اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا অর্থঃ নিশ্চয় দুঃখের সাথে সুখ নিহিত [সূরা ইনশিরাহ-৬]।

এখানে مع (মা'আ) শব্দটি এসে 'সাথে' অর্থ দিয়েছে। আমরা সকলেই জানি– কারো জীবনে সুখ এবং দুঃখ একই সাথে অবস্থান করে না। দিন কাটে হয় সুখে, নতুবা দুঃখে। সুতরাং এই আয়াতের মর্মার্থ বুঝতে হবে– দুঃখের পরেই

সুখ আসে। অর্থাৎ মা'আ শব্দটি বাক্যে ব্যবহার হওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় দুটো ঘটনার পরম্পরা বা পূর্বাপর কিংবা আগ-পিছ হওয়াটাও নির্দেশ করে। একইভাবে ফুসুসুল হিকামেও মা'আ শব্দটি পরম্পরা তথা পূর্বাপর অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে।

মা'আ শব্দটি যে পরম্পরা বা পূর্বাপর বোঝাতেই ব্যবহার করা হয়েছে তা (ফুসুসুল হিকামে বর্ণিত উপর্যুক্ত বর্ণনাগুলোর) পরের বাক্য থেকে আরও বেশি স্পষ্ট হয়। পরের বাক্য হলো– "বোনটি আগে জন্মগ্রহণ করবেন এবং তিনি পরে জন্মগ্রহণ করবেন।" অর্থাৎ এখানে ফুসুসুল হিকামের সরল অনুবাদটি হবে, আগে একজন বোন জন্মগ্রহণ করবেন এবং এর পরবর্তীতে ভাই (যিনি খাতেমুল আউলিয়া হবেন তিনি) জন্মগ্রহণ করবেন।
উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত পর্যালোচনা থেকে সুস্পষ্ট যে, মা'আ শব্দ দ্বারা যদি 'যমজ' অর্থ গ্রহণ করা হয় তবে তা কোনভাবেই ফুসুসুল হিকামের বর্ণনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখের দাবিদার, শায়খুল আকবর হযরত মুহিউদ্দিন ইবনু আরাবী (র.) ফুসুসুল হিকাম গ্রন্থটি আরবি ভাষায় রচনা করেছেন। পরবর্তীতে বিভিন্নজন এর উর্দু অনুবাদ করেছেন। এর মধ্যে একজন হলেন মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্ সিদ্দিকী (মস্তফায়ী প্রেস, লক্ষ্মৌ, প্রকাশকাল-১৯০৩)। তিনি তাঁর উর্দু অনুবাদে মা'আ শব্দের অনুবাদের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত পর্যালোচনার মতোই অনুবাদ করেছেন। অতিরিক্ত কিছু লিখেননি। তিনি وتولد معه أخت له এর উর্দূ অনুবাদ করেছেন اور اوسکے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوگی। মূলত হযরত অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী 'বেলায়তে মোত্লাকা' কিতাবে এই উর্দু অনুবাদ গ্রন্থটির রেফারেন্সই দিয়েছেন। [দ্রঃ স্ক্যান নং-১৯]
অপরদিকে মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল কাদের সিদ্দিকী (ইতিকাদ পাবলিশিং হাউজ, নিউ দিল্লি, প্রকাশকাল-১৯৯৪) নামক ফুসুসুল হিকামের অপর একজন উর্দু অনুবাদক মা'আ শব্দের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদে 'তাওয়াম তথা যমজ' শব্দটি ব্যাখ্যা হিসেবে লিখেছেন। এটি হলো তাঁর ব্যাখ্যা। তিনি তাঁর বুঝ-ব্যবস্থা অনুযায়ী একটি ব্যাখ্যা দিতেই পারেন। ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে

লিখতেই পারেন। যেমন, আমরা মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনের ক্ষেত্রে হরেক রকমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ (তাফসির) দেখি।

সুতরাং ফুসুসুল হিকামের ক্ষেত্রে সবসময় মূল আরবিই প্রাধান্য পাবে (যেহেতু ফুসুসুল হিকাম রচিত হয়েছে আরবিতে), পাশাপাশি আরবির অনুকূলে অনূদিত অনুবাদই প্রাধান্য পাবে।

তথ্যের সত্যনিষ্ঠতা নিরূপণে সম্মানিত সত্য-অনুসন্ধানী পাঠকের সুবিধার্থে উপরে বর্ণিত অনুবাদ গ্রন্থ দুটির সম্মানিত অনুবাদকদ্বয়ের নাম পরিচিহ্নিত করে প্রচ্ছদ দুটির স্ক্যান কপি সংযুক্ত করা হলো।

[দ্রঃ স্ক্যান নং-২০, ২১]

পরন্তু ফুসুসুল হিকাম হলো একটি কশ্‌ফি কিতাব। সুতরাং এই কিতাবের প্রকৃত মর্মার্থ সাহেবে কশ্‌ফ তথা কশ্‌ফ সম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত অপর কারও পক্ষে বুঝা সম্ভব নয়। ভাষায় পণ্ডিত যে কোন ব্যক্তিই আপন বুঝ-ব্যবস্থার আলোকে অনুবাদ, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে পারেন। কিন্তু কশ্‌ফ সম্পন্ন ব্যক্তির অনুবাদ, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই সর্বাধিক বিশুদ্ধ এবং গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত।

খাতেমুল অলি খাতেমুন নবির পবিত্র ধর্মের অনুগত বিধায়, তিনি পুত্র সন্তান রাখিয়া যান নাই যাহা রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র অনুরূপ

[বেলায়তে মোত্‌লাকাঃ পৃষ্ঠা- ৩২, তৃতীয় প্রকাশের পুনঃপ্রকাশ]

ফুসুসুল হিকাম গ্রন্থে উল্লেখ আছে– 'খাতেমুল আউলিয়া রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র ওয়ারিস হবেন'। তাই খাতেমুল আউলিয়ার মাঝে রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুটিত হবে। এরই আলোকে তিনি রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র মতো পৃথিবীতে পুত্র সন্তান রেখে ইন্তিকাল করবেন না। রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র তিন জন মতান্তরে চারজন পুত্র সন্তান ছিলেন। কিন্তু তাঁরা সকলেই রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র জীবদ্দশায় ইন্তিকাল করেন। একইভাবে খাতেমুল আউলিয়া হুযুর গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.) মাইজভাণ্ডারীর একমাত্র পুত্র শাহজাদায়ে গাউসুল আযম বেলায়তে মা'য়াব হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ ফয়জুল হক ফানায়ে ওয়াসেল মাইজভাণ্ডারী (ক.)ও হুযুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর ইন্তিকালের প্রায় চার বছর পূর্বে ১৯০২ সালে ইন্তিকাল করেন। এ প্রসঙ্গে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী গ্রন্থ "জীবনী ও কেরামত" গ্রন্থের একাদশ পরিচ্ছেদে উল্লেখ আছে– "হজরতের একমাত্র পুত্র সন্তান জনাব মৌলভী ফয়জুল হক সাহেব দুনিয়াতে দুইজন পুত্র সন্তান রাখিয়া অল্প বয়সে হজরতের পূর্বেই জান্নাতবাসী হন"। একই গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে উল্লেখ আছে– হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ ফয়জুল হক মাইজভাণ্ডারী ওফাত প্রাপ্ত হওয়ার কয়েক দিন পর

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী তাঁর খাদেমকে একটি শাল কাপড় ও নিজের পাগড়ি মোবারক দিয়ে বলেন, "এই শাল কাপড়খানা আমার ফয়জুল হক মিয়ার কবরের উপর পরাইয়া দাও। এবং এই পাগড়িটি তাঁহার ছিরানে রাখিয়া দাও। দস্তার বাঁধিবার জন্য তাঁহার আরজু ছিল"।

সুতরাং উপর্যুক্ত তথ্য-প্রমাণের আলোকে প্রমাণিত যে– খাতেমুল আউলিয়া গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র একমাত্র পুত্র হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ফয়জুল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) হযরত কেবলার জীবদ্দশায় ইন্তিকাল করেন।

ইহা (নবুয়ত) স্থান-কাল-পাত্র ও পরিবেশে সীমাবদ্ধ কিন্তু বেলায়ত অসীম

[বেলায়তে মোত্লাকা: পৃষ্ঠা- ২৪, তৃতীয় প্রকাশের পুনঃপ্রকাশ]

'নবুয়ত আল্লাহ্ পাক প্রদত্ত মহিমান্বিত পদবীর নাম'– 'বেলায়তে মোত্লাকা' গ্রন্থে এই উদ্ধৃতির মাধ্যমে নবুয়ত যে একটি মহিমাময় অতি মর্যাদাপূর্ণ পদবীর নাম তা পাঠক সমীপে তুলে ধরা হয়েছে। কারণ নবুয়ত এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং মহিমান্বিত মর্যাদার নাম, যে কেউ চাইলেই এই মর্যাদা ইবাদত-বন্দেগী ও রিয়াজতের মাধ্যমে হাসিল করতে পারেন না। এই অতি মর্যাদাপূর্ণ পদবীর অধিকারী তিনিই হন, যাঁকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বিশেষভাবে নির্বাচিত করেন। সুতরাং নবুয়তের মর্যাদা অনন্য। এরপর 'বেলায়তে মোত্লাকা' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে– 'ইহা (নবুয়ত) স্থান-কাল-পাত্র ও পরিবেশে সীমাবদ্ধ'। আপাত দৃষ্টিতে বিচার করলে যে কারও নিকট এই বাক্যটি নেতিবাচক মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবতার আলোকে বিবেচনা করলে এই বাক্যের যথার্থতা অতি সহজেই বুঝে আসে। চলুন এই বাক্যের যথার্থতা অনুসন্ধান করে আসা যাক–

স্থানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা: রাসুলে করিম (দ.) হলেন– রাহমাতুল্লিল আলামিন। তিনি কুল কায়েনাতের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। তাই তাঁর নবুয়ত হলো 'নবুয়তে আম্মাহ্'। অর্থাৎ তিনি সকল মানব এবং জীন জাতির জন্য নবি হয়ে আগমন করেছেন। কিন্তু তাঁর পূর্বে যত নবি-রাসুল প্রেরিত হয়েছেন তাঁরা

সকলেই সুনির্দিষ্ট কওম-গোত্র-গোষ্ঠী কিংবা এলাকার জন্য নবি হিসেবেই প্রেরিত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্পাক বলেন– وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا **অর্থ:** "প্রত্যেক জাতির জন্য আমি রাসুল পাঠিয়েছি" [সূরা আন নাহল: আয়াতাংশ- ৩৬]; অন্য আয়াতে বলেন– وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَاد **অর্থ:** "প্রত্যেক জাতির জন্য রয়েছে একজন পথ প্রদর্শক" [সূরা আর রাদ: আয়াতাংশ-৭]।

যে নবি যেই কওম, গোত্র বা এলাকার জন্য এসেছেন তাঁর আনীত শরিয়ত শুধুমাত্র সেই কওম, গোত্র বা এলাকার জন্য প্রযোজ্য; অন্য কওম, গোত্র বা এলাকার জন্য প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ প্রত্যেক কওম, গোত্র এবং এলাকার লোকজনের উপর সকল নবি রাসুলের উপর ঈমান আনার বিধান থাকলেও তাঁদের নবুয়তী বিধান তথা শরিয়ত পালনের বিধি বিধান ছিল না। যে যেই কওম, গোত্র বা এলাকার বাসিন্দা সে সেই কওম, গোত্র বা এলাকার নবির নবুয়তী বিধান তথা শরিয়ত পালন করবে। যেহেতু এক কওম, গোত্র বা এলাকার নবির শরিয়ত অপর কওম, গোত্র বা এলাকার মানুষের জন্য প্রযোজ্য নয়। সুতরাং এই ক্ষেত্রে নবুয়তের সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট। এর ব্যতিক্রম ঘটেছে শুধুমাত্র রাসুলে করিম (দ.)'র ক্ষেত্রে। কেননা তিনি নবুয়তে আম্মার অধিকারী হিসেবে সমগ্র সৃষ্টিকুলের নবি হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন।

কালের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা: রাসুলে করিম (দ.) খাতেমুন নবিঈন। তাঁর আগমনের মাধ্যমে নবুয়তের দরজা বন্ধ ঘোষিত হয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্পাক বলেন–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّنَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا

অর্থ: "মোহাম্মদ (দ.) তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহ্র রাসুল এবং শেষ নবি। আল্লাহ্ সব বিষয়ে জ্ঞাত" [সূরা আহযাব-৪০]।

একই সুরে রাসুলে পাক (দ.)ও বলেন– "আমিই সর্বশেষ নবি। আমার পর আর কোন নবি আসবে না"। সুতরাং বিশ্বনবি হযরত মোহাম্মদ (দ.)'র পর আর কোন নবি পৃথিবীতে আগমন করবেন না। যেহেতু সুদীর্ঘকাল ধারাবাহিকভাবে নবুয়তের ধারা চলমান থাকার পর উপযুক্ত একটি সময় এবং প্রেক্ষাপটে আখেরী

নবি হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.)'র আগমনের মাধ্যমে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন নবুয়তের দরজা বন্ধ ঘোষণা করেন সেহেতু এ ক্ষেত্রে নবুয়ত কালের প্রশ্নে সীমাবদ্ধ। আরও পরিষ্কার করে বললে– নবুয়ত ধারা হযরত আদম (আ.) হতে শুরু করে আমাদের প্রিয় নবি হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.) পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট সময় তথা সীমাবদ্ধ কালই প্রবাহিত ছিল। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য, কোন নবি তিনি নিজ ভিন্ন অপর কাউকে নবুয়ত অর্পণ করার অধিকার প্রাপ্ত নন। কেননা কে নবুয়ত প্রাপ্ত হবেন তা স্বয়ং আল্লাহ্ কর্তৃক পূর্ব নির্বাচিত এবং নির্ধারিত। কিন্তু নবিগণ কাউকে চাইলেই তাঁদের বেলায়ত অর্পণ করতে পারেন (উত্তরাধিকারী বানাতে পারেন) এবং তা প্রদানের অধিকার তাঁদের রয়েছে। এরই আলোকে রাসুলুল্লাহ্ (দ.) 'আনা মদিনাতুল ইলমে ওয়া আলীইয়ুমঁ বাবুহা' ঐতিহাসিক স্বীকৃতির মাধ্যমে হযরত আলী (রা.) কে তাঁর বেলায়তের উত্তরাধিকার ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র এই বেলায়ত আল্লাহ্ আউলিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত থেকেছে এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এজন্যই বেলায়ত অসীম। বেলায়তের অসীমতা সম্পর্কে শায়খুল আকবর মুহিউদ্দীন ইবনু আরাবী (র.) বলেন– نبوة التشريع ورسالته تنقطعان والولاية لا تنقطع أبدا **অর্থঃ** "নবুয়তে তাশ্‌রি' এবং রিসালাত উভয়ই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে কিন্তু বেলায়ত কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না। অর্থাৎ বেলায়ত অসীম।" [সূত্রঃ ফুসুসুল হিকাম, পৃষ্ঠাঃ ৬২, দ্রঃ স্ক্যান নং- ২২]

পাত্র ভেদে সীমাবদ্ধতাঃ নবুয়ত আল্লাহ্‌পাক প্রদত্ত অতি মর্যাদাপূর্ণ এবং মহিমান্বিত একটি পদবি। রাব্বুল আলামিন কর্তৃক বিশেষভাবে নির্বাচিতরাই শুধুমাত্র এই মহান মর্যাদার অধিকারী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। কেউ কামনা করলেই ইবাদত, রিয়াজত, মোজাহেদা এবং মোশাহেদার মাধ্যমে এই মর্যাদা হাসিল করতে পারেন না। কারণ কারা কারা নবুয়ত প্রাপ্ত হবেন তথা কোন পাত্রে নবুয়ত অর্পিত হবে তা আল্লাহ্ তায়ালার একান্ত ইচ্ছাধীন, পূর্ব নির্ধারিত এবং তাঁদের সংখ্যাও সীমিত তথা সীমাবদ্ধ। কিন্তু বেলায়ত বিষয়টি ভিন্ন। বেলায়ত অর্থই হলো প্রেম, ভালবাসা। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টির মাধ্যমে যাঁরাই আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করতে সক্ষম হন তাঁদের সকলকেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বেলায়ত প্রদান করেন। বিল আসালাত তথা প্রকৃতিগতভাবেই বেলায়তধারী ব্যতীত বেলায়তের অন্যান্য অবস্থানের ক্ষেত্রে

রাব্বুল আলামিন বেলায়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যাকে সীমিত রাখেননি। অর্থাৎ কঠোর রেয়াজত, মোজাহেদা, মোশাহেদার মাধ্যমে বেলায়ত অর্জনের পথ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন উন্মুক্ত রেখেছেন। এই দৃষ্টিকোণে নবুয়ত পাত্রভেদে সীমাবদ্ধ কিন্তু বেলায়ত অসীম।

পরিবেশের সীমাবদ্ধতা: আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু। তিনি বান্দার উপর এমন কোন হুকুম আরোপ করেন না, যা পালন করা অতি কষ্টসাধ্য বা দুঃসাধ্য। তাই রাব্বুল আলামিন কর্তৃক আরোপিত মানুষের উপর অর্পিত নবুয়তি বিধান তথা শরিয়তি আদেশ-নিষেধে পরিবেশ, পরিস্থিতি, সময়, প্রেক্ষাপট ইত্যাদি অত্যন্ত সচেতনভাবে বিবেচিত হয়েছে। যেমন, শরিয়তে মোহাম্মদীর কোন অনুসারী যদি পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানির ব্যবস্থা করতে না পারে তবে সেই পরিবেশে তাঁর জন্য তায়াম্মুমের ব্যবস্থা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক বলেন−

فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا

অর্থ: "যদি পানি না পাও তাহলে পাক-পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নাও" [সূরা মায়েদা: আয়াতাংশ-৬]।

মুসাফির কিংবা অসুস্থ অবস্থায় কেউ যদি রোযা পালনে সক্ষম না হয় তবে পরবর্তীতে তা আদায়ের ব্যবস্থা রয়েছে।
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্পাক বলেন−

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ

অর্থ: "যদি তোমাদের কেউ রোগগ্রস্ত অথবা মুসাফির হও, সে যেন পরবর্তীতে রোযাগুলো পূর্ণ করে নেয়" [সূরা বাক্বারা: ১৮৪]।
এমনকি যে সকল খাবার ভক্ষণ করা পবিত্র কুরআন দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হয়েছে, ক্ষুধার তাড়নায় কারও যদি প্রাণ যাওয়ার উপক্রম হয়, তবে সেই পরিবেশে হারাম হওয়া বস্তুও খাওয়ার বিধান রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্পাক বলেন−

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থঃ "মৃত জীব, রক্ত, শুকরের মাংস এবং সেসব জীব-জন্তু যা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারও নামে উৎসর্গ করা হয় তা তিনি তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য (তা ভক্ষণ করাতে) কোন পাপ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মহান ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু" [সূরা বাক্বারাঃ **১৭৩**]।

অর্থাৎ স্বাভাবিক পরিবেশ-পরিস্থিতিতে যা অবৈধ, প্রতিকূল পরিবেশ, পরিস্থিতিতে তারও বৈধতা শরিয়তে প্রদান করা হয়েছে। এ থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট, তা হলো– সকল পরিবেশ-পরিস্থিতিতে সকলের জন্য নবুয়তি বিধান এক ও অভিন্ন নয়।

উপর্যুক্ত দৃষ্টিভঙ্গিগুলোর কুরআনিক বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেই মূলত বেলায়তে মোত্লাকা গ্রন্থে বলা হয়েছে যে– "নবুয়ত আল্লাহ্ প্রদত্ত মহিমান্বিত পদবির নাম। ইহা স্থান, কাল, পাত্র ও পরিবেশে সীমাবদ্ধ"।

প্রকৃতপক্ষে বেলায়তই নবুয়তের প্রাণ

[বেলায়তে মোত্‌লাকা: পৃষ্ঠা- ২৪, তৃতীয় প্রকাশের পুনঃপ্রকাশ]

যে কোন বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে জানতে বা পরিপক্ক হতে পড়াশোনার বিকল্প নেই– একথা সর্বজন স্বীকৃত। কারণ অল্প বা অর্ধেক জানাশোনা আলোর পরিবর্তে অন্ধকারেই নিয়ে যায়। পরন্তু এই অল্প জানাশোনা যদি ছড়িয়ে দেওয়া হয় তখন ঘটে ভয়ংকর ব্যাপার– পৃথিবীতে সৃষ্টি হয় চরম বিশৃঙ্খলা। এ বিশৃঙ্খলার ব্যাপ্তি বা প্রভাব কতটুকু হবে তা নির্ভর করে অল্প জানাশোনার কারণে যে বিষয়টি সম্পর্কে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয় সেটির গুরুত্বের উপর।

প্রত্যেক পরিমণ্ডলে বা আলোচনার মহলে যেমন কিছু তত্ত্ব, পরিভাষা, গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় থাকে ঠিক একইভাবে তাসাওউফ পরিমণ্ডলেও এরূপ কিছু পরিভাষা রয়েছে। এবং স্বাভাবিকভাবেই সুস্পষ্ট যে, এ ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে জানতে বা জানাতে হলেও তাসাওউফের ইতিহাস ও এ বিষয়ক মৌলিক কিতাবগুলো অধ্যয়ন করা আবশ্যক। আর ঠিক তেমনই একটি পরিভাষা হলো, الولاية أعلى من النبوة। যার মর্মার্থ দাঁড়ায়– "প্রকৃতপক্ষে বেলায়তই নবুয়তের প্রাণ" বা "বেলায়ত নবুয়ত হতে শ্রেষ্ঠ"। যেটি রয়েছে মাহবুবে সুবহানী কুতুবে রব্বানী গাউসুল আযম জিলানী শেখ সৈয়দ মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের (ক.)'র সুবিখ্যাত তাসাওউফ গ্রন্থ "আল্ ফাতহুর রব্বানী ওয়াল ফয়জুর রহমানী" ও শায়খ মুহিউদ্দিন ইবনু আরাবী (র.)'র কিতাব 'ফুসুসুল হিকাম'সহ তাসাওউফ জগতের আরও সুপরিচিত কিতাবাদিতে। উল্লেখ্য, এরই ধারাবাহিকতায় অছিয়ে

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী তাঁর কিতাব বেলায়তে মোত্লাকায়ও এটি তুলে ধরেছেন ফুসুসুল হিকামের রেফারেন্স দিয়ে। পরন্তু এই পরিভাষাটির মূল অর্থ কী বা এর ব্যাখ্যা কী– তাও ‘ফুসুসুল হিকাম’ কিতাবে উল্লেখ রয়েছে এভাবে–

فإذا سمعت أحدا من أهل الله يقول أو ينقل إليك عنه أنه قال الولاية أعلى من النبوة ، فليس يريد ذلك القائل إلا ما ذكرناه. أو يقول إن الولي فوق النبى والرسول ، فإنه يعني بذلك في شخص واحد

অর্থ: “যখন কোন আহলুল্লাহ্ ব্যক্তি থেকে তুমি শুনবে অথবা তাঁর পক্ষ থেকে তোমার নিকট বর্ণনা করা হবে যে, তিনি বলেছেন– الولاية أعلى من النبوة অর্থ: বেলায়ত নবুয়তের উপরে। এটা দ্বারা ঐ আহলুল্লাহ্ ব্যক্তির উদ্দেশ্য এ নয় যে, ‘নিশ্চয় একজন অলি নবি ও রাসুলের চেয়ে উঁচু দরজার হবে’। বরং এর উদ্দেশ্য হলো তা ‘একজন ব্যক্তির (নবির) সত্তায় বিদ্যমান বেলায়ত তাঁর জন্য তাঁর নবুয়ত থেকে শ্রেষ্ঠ’ [ফুসুসুল হিকাম, পৃষ্ঠা: ১৩৫, দ্রঃ স্ক্যান নং-২৩]।”
অর্থাৎ একজন নবির সত্তায় বেলায়ত ও নবুয়ত উভয়টিই বিদ্যমান থাকে– একথা সর্বজন জ্ঞাত। সুতরাং, উপর্যুক্ত পরিভাষাটি একজন নবির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাঁর সত্তায় যে বেলায়ত বিদ্যমান তা তাঁর নবুয়ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ পরিভাষাটি তাসাওউফের আরও অনেক প্রসিদ্ধ কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, মাহবুবে সুবহানী কুতুবে রব্বানী গাউসুল আযম জিলানী শেখ সৈয়দ মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের (ক.) তাঁর সুবিখ্যাত তাসাওউফ গ্রন্থ “আল্ ফাতহুর রব্বানী ওয়াল ফয়জুর রহমানী”-এর ২৪৮ পৃষ্ঠার ৬২ নম্বর মজলিসে বলেন– والاخلاص اساس النبوة **অর্থ:** ইখলাস (বেলায়ত) হলো নবুয়তের ভিত্তি। [দ্রঃ স্ক্যান নং-২৪]

তাসাওউফ পরিমণ্ডলের উজ্জ্বল নক্ষত্র আল্লামা আবদুর রহমান চিশ্তী (র.) তাঁর সুবিখ্যাত তাসাওউফ গ্রন্থ “মিরআতুল আসরার”-এর ৪১ পৃষ্ঠায়ও একই পরিভাষা ব্যক্ত করেন এভাবে– الولايت افضل من النبوة **অর্থ:** নবুয়ত হতে বেলায়ত শ্রেষ্ঠ। [দ্রঃ স্ক্যান নং-২৫]

পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাই, তাসাওউফের সারতত্ত্বরূপ কিতাব 'বেলায়তে মোত্লাকা'য়ও কিতাবটির সম্মানিত মোসান্নেফ গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র উত্তরাধিকারী আউলাদে রাসুল (দ.) শাহ্ সুফি হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) একই পরিভাষা সংকলন করে প্রকারান্তরে তাসাওউফ পরিমণ্ডলের বিশেষ পরিভাষাগুলোর সাথে মেলবন্ধন নির্মাণ করিয়ে দিয়ে চিন্তাশীলদের জন্য তাসাওউফ পরিভ্রমণের পথ সুগম করে দেন।

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللهَ
وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ فَاِنْ
تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ

তাওহিদে আদ্‌ইয়ান

[বেলায়তে মোত্‌লাকা: পৃষ্ঠা- ২৪, তৃতীয় প্রকাশের পুনঃপ্রকাশ]

বিশ্ব সমাজ ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, এই পৃথিবীতে অসংখ্য মত-পথ-ধর্ম-দর্শন ও আদর্শের মানুষ বসবাস করে। এখানে মানুষের মাঝে ধর্মীয় রীতি-নীতি-আচার-অনুষ্ঠান ও অভ্যাসে ভিন্নতা রয়েছে। এখন এতোসব ভিন্নতার মাঝে এক ধর্মের সাথে অন্য ধর্মের সম্পর্ক কেমন হবে? সম্পর্কগুলো কি সম্প্রীতিময় হবে না-কি শত্রুতাপূর্ণ হবে? এক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামার জীবনাদর্শই হবে আমাদের মূলনীতি। পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা হচ্ছে–

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِه شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ

অর্থ: "(হে রাসুল) বলুন, হে আহলে কিতাব, আস সেই কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই। আর তা হলো এই যে, আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারও ইবাদত করবো না, কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করবো না এবং আমাদের কেউ আল্লাহ্ ব্যতীত একে অপরকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করবো না" [সূরা আলে ইমরান : ৬৪]।

উপর্যুক্ত আয়াতে করিমায় স্বয়ং রাব্বুল আলামিন রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র মাধ্যমে 'তাওহিদে' (একত্ববাদ) বিশ্বাসীদেরকে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক মতভিন্নতা কিংবা অমিলের ক্ষেত্র থাকা সত্ত্বেও সুনির্দিষ্ট মিলের সূত্র খুঁজে নিয়ে বিশ্বসমাজ ব্যবস্থায় একটি ফর্মূলা দাঁড় করানোর আহ্বান জানিয়েছেন। এছাড়া পৃথিবীতে শান্তি আনয়ন করা (প্রায়) অসম্ভব ব্যাপার। কারণ যত যা-ই হোক না কেন, ইসলামের নীতি হলো সর্বযুগে, সর্বাবস্থায় বাস্তবমুখী।

উপরন্তু সকল ধর্মের মানুষ আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, সকল ধর্মের মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ্ এবং সকল ধর্মাবলম্বীর প্রত্যাবর্তনস্থলও আল্লাহ্। তাই "আল্লাহ্ এক" এই বিষয়ে সকলে একমত থেকে কোন রকম হুজ্জত তথা বিবাদে লিপ্ত না হয়ে আপন আপন ধর্মানুসারে কর্ম করে যাওয়া প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন–

اَللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ

অর্থ: "আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আমাদের কর্ম আমাদের, তোমাদের কর্ম তোমাদের। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন ধরনের বিবাদ-বিসংবাদ নেই। আল্লাহ্-ই আমাদেরকে একত্রিত করবেন এবং প্রত্যাবর্তন তারই নিকট" [সূরা শুরা: আয়াতাংশ-১৫];

قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا فِى اللهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ

অর্থ: "বলুন, আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমরা কি আমাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও (?)– যখন তিনি আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের" [সূরা বাক্বারা: আয়াতাংশ-১৩৯]। এছাড়া আরও ইরশাদ করেন,

وَلَوْشَآءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَآ اٰتٰكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ

অর্থ: "যদি আল্লাহ্ চাইতেন তবে তোমাদের সবাইকে এক উম্মত করে দিতেন। কিন্তু এরূপ করেননি, যাতে তোমাদেরকে যে ধর্ম দিয়েছেন তাতে তোমাদের পরীক্ষা নেন। অতএব দৌড়ে কল্যাণকর বিষয়াদি অর্জন কর" [সূরা মায়েদাহ: ৪৮];

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

অর্থ: "দ্বীনের ব্যাপারে যাঁরা তোমাদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করেনি, তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ্ তো ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন" [সূরা মুমতাহিনা : ৮]।

সুতরাং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আল্ কুরআনের উপর্যুক্ত নীতি অনুসরণ করা অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মের মধ্যকার মিলের জায়গাগুলো চিহ্নিত করে ঐসব ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহাবস্থানের নীতি প্রণয়ন করা এবং সহানুভূতিশীল হওয়া নেহায়েত জরুরী। এই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি মানে সবাই আপন আপন ধর্ম ছেড়ে দিয়ে নতুন একটি ধর্মনীতি প্রণয়ন করা নয়। বরং এর অর্থ হলো প্রত্যেকেই আপন আপন ধর্ম পালন করবে, উপরন্তু বিভিন্ন ধর্মের মধ্যকার অভিন্ন তথা মিল (Commonalities) আছে এমন বিষয়গুলোর ভিত্তিতে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহযোগিতারও একটি ক্ষেত্র তৈরি করে নেবে। যেমন, আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে চার দলীয়, চৌদ্দ দলীয় ঐক্যজোট দেখতে পাই। এই ঐক্যজোট গঠন করা মানে আপন আপন দলের নিয়মনীতি বিসর্জন কিংবা ছেড়ে দিয়ে অন্য দলের হয়ে যাওয়া নয়। বরং আপন আপন দলে থেকে পরস্পর একমত পোষণীয় সুনির্দিষ্ট কিছু মূলনীতিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টা মাত্র। এভাবে কমন (Common) কিছু বিষয়ের ভিত্তিতে একতাবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে পারস্পরিক সহানুভূতির বিষয়টিও অগ্রগামী হয়। যেমন, ভাষাকে যদি ঐক্যের ভিত্তি বানানো হয় তখন একজন মানুষ যে দেশেরই নাগরিক হোক না কেন তার মাতৃভাষা যদি বাংলা হয়, তখন তাকে আমরা বাঙ্গালি বলি। অন্য ভাষাভাষীদের চেয়ে তার প্রতি আলাদা একটা সহানুভূতি কাজ করে। যদি দেশকে ঐক্যের ভিত্তি বানানো হয় তখন একজন নিজের দেশের মানুষ সে যে ধর্মেরই হোক না কেন, তার প্রতি অন্য দেশের নাগরিকের চেয়ে অতিরিক্ত একটা টান অনুভব হয়। তার প্রতি আলাদা একটা সহানুভূতি কাজ করে। একইভাবে যদি আল্লাহ্র একত্ববাদ তথা তাওহিদকে মূলসূত্র ধরা হয়, তবে দেখা যায়– একত্ববাদে বিশ্বাসী সে যে ধর্মের, গোত্রের, দেশের হোক না কেন, আল্লাহ্ তথা স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকারকারীদের বিপরীতে তাদের পারস্পরিক অবস্থান অপেক্ষাকৃত

নিকটবর্তী এবং স্রষ্টা অবিশ্বাসীদের বিপরীতে তাদের বিশ্বাসের বিষয়বস্তু এক এবং নৈতিক অবস্থানও অভিন্ন। স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী, স্রষ্টার একত্ববাদে স্বীকৃতিদানকারী যতগুলো ধর্ম রয়েছে সেগুলোর মধ্যকার পারস্পরিক দূরত্ব স্রষ্টা অবিশ্বাসীদের তুলনায় অনেক কম। আর এই "অপেক্ষাকৃত কম" বিষয়টিকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে একত্ববাদী সকল ধর্মের সমন্বয়ে পৃথিবীতে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ (Harmonious Society) নির্মাণ করার একটি প্রচেষ্টার নামই হচ্ছে "তাওহিদে আদ্‌ইয়ান"। তাওহিদে আদ্‌ইয়ান তত্ত্বের মর্মার্থ হলো "আল্লাহ্‌র একত্ববাদে বিশ্বাসী যত ধর্ম রয়েছে সেগুলোর মাঝে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করা"। এটি মূলত রাসুল (দ.)'র রেসালতেরই একটি হুকুম।

প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য, সূরা বাক্বারার ৬২ নম্বর আয়াত এবং সূরা মায়েদার ৬৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِئِيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْۚ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

অর্থঃ "যারা খোদা বিশ্বাসী এবং যারা ইহুদি, নাসারা (খ্রিস্টান) বা সাবেয়িন– যেই হোক না কেন, যদি তারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং সৎকাজ করে তার পুরস্কার আল্লাহ্ তায়ালার নিকট রক্ষিত আছে। তাদের কোন ভয়ভীতি এবং অনুতাপ নেই।" [সূরা বাক্বারাঃ ৬২]

এই আয়াতদ্বয়ে বর্ণিত স্রষ্টা বিশ্বাসী এবং সৎকর্মশীল আহলে কিতাবীদের প্রতিদানের বিষয়টি অনেক সময় নাসেখ-মানসুখের চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। অথচ আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী (র.)'র গবেষণা প্রসূত নাসেখ-মানসুখের তালিকাসহ অন্যান্য তাফসীরকারগণের প্রদানকৃত তালিকায় এই আয়াতদ্বয়কে মানসুখ বলা হয়নি। আবার অনেক সময় এই আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা করা হয়, "আহলে কিতাবীদের সৎকর্মের পুরস্কার দুনিয়াতে প্রদান করা হবে। আখেরাতে তাদের কোন প্রতিদান নেই"। অথচ এই আয়াতদ্বয়ের প্রাণধারা (Spirit)-এর আলোকে এই ব্যাখ্যা সঙ্গতিপূর্ণ হয় না। কেননা আয়াতদ্বয়ে মহান আল্লাহ্ পাক ঈমানদারদের কথাও উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ ঈমানদার এবং ইহুদি, নাসারা, সাবেঈনদের মধ্যে যারাই আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাস করে সৎকর্ম করবে প্রত্যেকের প্রতিদান আল্লাহ্‌র নিকট রক্ষিত আছে। সুতরাং এখানে

প্রতিদানকে যদি দুনিয়াবী প্রতিদান ধরা হয় তবে কি ঈমানদারও শুধু দুনিয়ায় প্রতিদান পাবেন? উপরন্তু "পুরস্কার আল্লাহ্‌র নিকট রক্ষিত থাকা" দ্বারা সেই পুরস্কার যে আখেরাতেই দেওয়া হবে তা স্পষ্ট। পরন্তু আহলে কিতাব ওয়ারাকা ইবনে নওফেল প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ্ (দ.) বলেন– হযরত আয়েশা (রাদ্বি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসুল (দ.) বলেছেন–

لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين

অর্থ: "তোমরা ওয়ারাকাকে গালমন্দ করো না। কারণ আমি দেখেছি তাকে একটি বা দুটি জান্নাত দেওয়া হয়েছে" [হাকিম আল মুসতাদরাক। তিনি বলেন– হাদিসটি বুখারী এবং মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ্]। মা আয়েশা সিদ্দিকা (রাদ্বি.) থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদিসে আছে– খাদিজা (রাদ্বি.) রাসুলুল্লাহ্ (দ.)-কে ওয়ারাকা ইবনে নওফেল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। জবাবে রাসুলুল্লাহ্ (দ.) বলেন–

قد رأيته فرأيت عليه ثياب بياض فأحسبه لو كان من اهل النار لم يكن عليه ثياب بياض

অর্থ: "আমি তাকে স্বপ্নে দেখেছি। আমি দেখলাম, তার উপর সাদা কাপড় রয়েছে। আমার ধারণা– তিনি যদি জাহান্নামী হতেন– তাহলে তার উপর সাদা কাপড় থাকতো না" [ইবনে কাসীর– আস সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ]। একইভাবে আসআদ তুব্বার ব্যাপারে রাসুল (দ.) বলেন–

لا تسبو تبعا فانه قد كان اسلم

অর্থ: "তোমরা তুব্বাকে গালি দিও না। কারণ তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।"

অথচ আসআদ তুব্বা রাসুলুল্লাহ্ (দ.) পৃথিবীতে আগমনের পূর্বেই ইন্তেকাল করেছিলেন। [সূত্র: আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া]

নবি (দ.)'র জীবনে "তাওহিদে আদ্‌ইয়ান" চর্চার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো– মদিনা সনদ, হুদায়বিয়ার সন্ধি (ফাতহুম্ মুবিন), মক্কা বিজয় পরবর্তী ভাষণ, বিদায় হজের ভাষণ ইত্যাদি। এ সবকটি সম্পাদিত হয়েছে রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র পবিত্র জীবদ্দশায় স্বয়ং তাঁর মাধ্যমে। রাসুলুল্লাহ্ (দ.) মদিনা সনদে ইহুদি, খ্রিস্টান,

পৌত্তলিক এবং মুসলমানদেরকে 'উম্মাতাওঁ ওয়াহেদা' (এক উম্মাহ্) সম্বোধন করে শান্তিপূর্ণ বহুত্ববাদী সমাজ (Pluralist Society) প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীকে আপন আপন ধর্মীয় আচার পালনের স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। মক্কার কাফেরদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি করার সময় সন্ধির শুরুতে আল্লাহ্র প্রশংসার পর রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র রেসালতের ব্যাপারে লিখিত শব্দ নিয়ে কাফেররা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিল। তখন রাসুলুল্লাহ্ (দ.) নিজ হাতে "রাসুলুল্লাহ্" শব্দটি কেটে দিয়ে সেখানে মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ লিখে দিয়েছেন। এমনকি সেই সন্ধি অনুযায়ী সেই বছরের জন্য ইসলামের অন্যতম মূল ভিত্তি হজ পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিলেন। রাসুলুল্লাহ্ (দ.) এইটুকু পর্যন্ত ছাড় দিয়ে শুধুমাত্র আল্লাহ্র একত্ববাদের স্বীকৃতির বিষয়টিকে মিলের জায়গা ধরে নিয়ে পারস্পরিক শান্তি চুক্তি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। নবি জীবনের এই মহান শিক্ষাই মূলত তাওহিদে আদ্ইয়ান-এর অন্যতম বুনিয়াদ। বিদায় হজের ভাষণেও রাসুলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন– "হে মানব সকল, নিশ্চয়ই তোমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ একজন, তোমাদের সকলের পিতা হযরত আদম (আ.)। ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে কোনরূপ জোরজবরদস্তির আশ্রয় গ্রহণ করো না"। এছাড়াও বিভিন্ন রাজাদের নিকট রাসুলুল্লাহ্ (দ.) দূত মারফত যে পত্র পাঠান, সেখানেও সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নং আয়াতের আলোকে "আল্লাহ্ এক" এই মিলের জায়গায় একত্রিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র চাচা আবু তালিব প্রকাশ্যে শরিয়তে মোহাম্মদী গ্রহণ করেননি। কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রাসুলুল্লাহ্ (দ.)-কে মক্কার কাফেরদের আক্রমণ-অত্যাচার থেকে আশ্রয় দিয়েছেন, বুকে আগলে রেখেছেন। এমনকি শিয়াবে আবি তালিবে দীর্ঘ তিন বছর অবরুদ্ধ থেকে মুসলমানদের সাথে অতি কষ্টকর পরিস্থিতি বরণ করে নিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ্ (দ.) এবং মুসলমানদের জন্য এই অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষা ও ভালবাসাকে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিত? একইভাবে সম্রাট নাজ্জাশীর ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে ধারণা পাওয়া গেলেও, তিনি যে প্রকাশ্যে ইসলামের আচার অনুষ্ঠান পালন করেননি তা সর্বজনজ্ঞাত। আমৃত্যু তিনি খ্রিস্টান ধর্মানুসারে জীবন অতিবাহিত করেছেন। অর্থাৎ পরিবেশ পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় রেখে তিনি 'তাসদিক বিয যানান' তথা অন্তরের দিক দিয়ে ইসলামকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু 'ইকরার বিল

লিসান’ তথা ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কথা মৌখিকভাবে প্রকাশ করেননি। অথচ রাসুলুল্লাহ্ (দ.) তাঁকে মুসলমানদের ভাই বলেছেন এমনকি সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর জানাযা আদায় করেছেন। বুখারী শরিফের হাদিসে আছে–

عن جابر رضي الله عنه قال النبي ﷺ حين مات النجاشي مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة

অর্থ: একদিন নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাবশার অধিবাসী একজন নেককার লোক মারা গেছেন। তোমরা তোমাদের ভাই ‘আসমাহা’ (নাজ্জাশী)-এর জানাযা পড়ার জন্য প্রস্তুত হও। [সহিহ্ বুখারী, দারু তওকিন নাজাত, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫১, হাদিস: ৩৮৭৭]

বুখারী শরিফের অন্য হাদিসে এসেছে–

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي ﷺ إلى أصحابه النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعا

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সাহাবায়ে কেরামের কাছে উপস্থিত হয়ে নাজ্জাশীর মৃত্যু সংবাদ শোনালেন এবং জানাযার নামায পড়ার জন্য সামনে অগ্রসর হলেন। সাহাবায়ে কেরাম তাঁর পেছনে কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়ালেন। অতঃপর রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার তাকবির দিলেন। [সহিহ্ বুখারী, দারু তওকিন নাজাত, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৮৬, হাদিস: ১৩১৮]

এই ঘটনাগুলো আমাদেরকে কী বার্তা দেয়? উপরন্তু এই ঘটনাগুলোর সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মর্মার্থের আলোকে আজকের বিশ্বে যারা শরিয়তে মোহাম্মদীর প্রতি উল্ফত তথা ভালবাসা রাখে, বিভিন্নভাবে সহযোগিতা-সম্প্রীতি বজায় রাখে তাদেরকেই বা কোন দৃষ্টিতে দেখা উচিত? তাওহিদে আদ্ইয়ান তত্ত্বের স্বতঃসিদ্ধতা নিরুপনে এ প্রসঙ্গগুলো আমাদেরকে সহযোগিতা করবে।

সুফিয়ায়ে কেরামের খানকাহ্-দরবারগুলো যুগ যুগ ধরে সকল ধর্ম-বর্ণ-গোত্র, সমাজের উঁচু-নিচু শ্রেণি সকলের জন্য উন্মুক্ত। তাঁদের দরবার ও খানকাহ্গুলোতে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরও প্রবেশাধিকার অবারিত হয়ে আসছে সেই তখন থেকে। ভারতের সুপরিচিত হযরত ওয়ারেস আলী শাহ্-এর উল্লেখযোগ্য শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। যেমন ঠাকুর পঞ্চম সিং,

রাজা উদয় নারায়ণ সিং, বাবু মতি নিসার, ঠাকুর গৌর মহান সিং, জমিদার ডি.টি মইনপুরীসহ আরও অনেকেই ছিলেন। একইভাবে হযরত ফরিদুদ্দীন গেহরবী (রহ.) এবং পাকিস্তানের চিশ্‌তিয়া ত্বরিকার বিখ্যাত শায়খ হযরত খাজা সুলাইমান তাওঁসবি (রহ.)-এর মুরিদানদের মধ্যে অনেকেই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। প্রসঙ্গত হযরত খাজা সুলাইমান তাওঁসবি (রহ.)-এর জীবনী গ্রন্থ "তাজকিরায়ে হযরত খাজা সুলাইমান তাওঁসবি" গ্রন্থের ৩৭১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য–

ایک ہندو نے آکر حضرت قبلہؒ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کی زیارت کا مجھے بہت ہی شوق تھا حضرت قبلہ قدس سرہ نے فرمایا کہ ہمارے طریقہ میں یہ بات داخل ہے کہ مسلمانوں اور ہندوں کے ساتھ صلح رکھی جائے اور یہ بیت بطور شہادت کے پڑھا ہے

حافظا گر وصل خواہی صلح کن باخاص وعام

با مسلماں اللہ اللہ با برہمن رام رام

অর্থ: "একদিন গ্রন্থকার হযরত কেবলা (খাজা সুলাইমান তাওঁসবি রহ.)-এর খেদমতে বসা ছিলেন। তখন একজন হিন্দু এসে হযরত কেবলার কদমে আরজ করলেন, 'আপনার সাক্ষাতের জন্য আমার অন্তরে প্রবল ইচ্ছা ছিল।' তখন হযরত কেবলা এ কথা বলেন যে, 'আমার ত্বরিকায় মুসলমান এবং হিন্দুর সাথে সুলেহ্ তথা শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক রাখার অনুমতি রয়েছে'। এরপর তিনি হাফেজ সিরাজীর একটি কবিতার লাইন পড়লেন–

'হে হাফেজ, সাধারণ এবং বিশিষ্টদের মাঝে সুলেহের সম্পর্কের ইচ্ছা কর, মুসলমানের সাথে আল্লাহ্ আল্লাহ্, ব্রাহ্মণের সাথে রাম রাম'।" [দ্রঃ স্ক্যান নং-২৬]

কাদেরিয়া ত্বরিকার ইমাম গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (ক.)'র ওয়াজের মজলিসেও অনেক ইহুদি-খ্রিস্টান বসতেন (দ্র. বাহজাতুল আসরার)। যা তাওহিদে আদ্‌ইয়ান চর্চার অন্যতম উদাহরণ। ফাতহুর রব্বানী কিতাবে ৫০৫-৫০৬ পৃষ্ঠায় গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (ক.) বলেন– "খোদার বন্ধুদের সাহচর্য গ্রহণ কর। তাঁহারা যাহার প্রতি নজর বা হিম্মত নিবদ্ধ করেন, তাহার রূহানি বা সূক্ষ্ম জীবন আরম্ভ হইতে হয়। সে ব্যক্তি যদি ইহুদি, নাছারা, মজুছিও হয় তবুও। আর যদি মুসলমান হয় তবে ঈমান

শক্তিশালী হয়"। হযরত খাজা কামালুদ্দীন (র.) 'এশাআতুল ইসলাম' রেসালার ১৯২৭ সালে প্রকাশিত সংখ্যার "খলিফাতুল্লাহি আলাল আরদ" প্রবন্ধে উল্লেখ আছে–

میں مانتا ہوں کہ ہر ایک مذہب انسان کی مساعی کے لئے ایک ہی منزل مقصود تجویز کرتا ہی- گوان راہوں میں جو اس منزل تک پہنچتی ہیں- سب کا اختلاف ہے مگر خواہشات نفسانی کی قربانی کے اصول کے سب موافق ہیں

অর্থ: "মানবজাতি চেষ্টার মাধ্যমে একই নির্দিষ্ট স্থানের তালাশে মশগুল দেখা যায়। চেষ্টার পদ্ধতি বিভিন্ন হইলেও প্রবৃত্তি নিবৃত্তির ব্যাপারে সকলই একমত"। [দ্রঃ স্ক্যান নং-২৭]

মিশরের ফুয়াদ (বর্তমানে কায়রো) ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. মোস্তফা হেলমী রচিত এবং পাকিস্তানের রঈছ আহমদ জাফরী অনুদিত "তারিখে তাসাওউফে ইসলামী" কিতাবে "তাওহিদে আদ্ইয়ান" নামে আলাদা একটি পরিচ্ছেদও রয়েছে। উক্ত পরিচ্ছেদে বর্ণিত মূল এবারত এবং এর সরলানুবাদ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

توحید ادیان

یہ بھی منصور حلاج کا ایک نظریہ تھا

حلاج کا خیال تھا کہ تمام ادیان اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک ہیں۔ ان کا فروعات میں اختلاف ہے لیکن اصل کا جہاں تک تعلق ہے وہ ایک ہی ہے۔ تمام ادیان کا مرکز اور منبع خدا ہے۔ تمام ادیان خدا کے لیے ہیں، ہر دین سے کوئی نہ کوئی گروہ وابستہ ہے۔ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ کسی بالا دست قوت کی مرضی سے جو شخص کسی مذہب کا بطلان کرتا ہے وہ گویا حکم لگاتا ہے کہ فلاں مذہب اس نے خود اختیار کیا، اور یہ بات حلاج کی رائے میں مسلک قدریہ کے ذیل میں آتی ہے اور اس کے نزدیک اس امت کے مجوس جو لوگ کہلا سکتے ہیں، وہ قدریہ ہیں۔

حلاج کا یہ خیال بھی تھا یہودیت اور مسیحیت اور اسلام اور دوسرے مذاہب کے نام اور القاب جدا جدا ہیں۔ علامات و آثار میں بھی اختلاف اور تغائر ہے لیکن جو مقصود اصلی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں، وہ ایک ہی ہے۔

অনুবাদঃ "তাওহিদে আদ্ইয়ান। এটিও মনসুর হাল্লাজের একটি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। হাল্লাজের ধারণা ছিল যে, যতগুলো ধর্ম আছে সেগুলো হাকিকতের দিক হতে এক। শাখাগত বিষয়ে ভিন্নতা থাকলেও কিন্তু মূলের সাথে যে সম্পর্ক তা একই। প্রত্যেক ধর্মের মারকাজ (কেন্দ্র) এবং মান্বা' (উৎস) হলো খোদা। যত ধর্ম সকলই আল্লাহ্‌র জন্য। প্রত্যেক ধর্মের মাঝে কোন না কোন দল, গোত্র রয়েছে। এটা নিজের ইচ্ছাতে নয়, বরং শক্তিশালী সত্তার (আল্লাহ্) ইচ্ছাতে। কোন ব্যক্তি কোন মাযহাবকে বাতিল সাব্যস্ত করে যদি এই হুকুম জারী করে যে, 'অমুক মাযহাব সে নিজেই এখতিয়ার করেছে' তবে এরূপ কথা হাল্লাজের মতে কদরিয়া মতবাদের আওতায় এবং নিকটে চলে আসে। এই উম্মতের মধ্যে মাজুস যে সকল লোককে বলা হয় তারা কদরিয়া। হাল্লাজের এই ধারণা ছিল যে, ইহুদিয়াত, মসিহিয়্যত (খ্রিস্টান), ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মের নাম এবং লকব আলাদা আলাদা। চিহ্ন ও প্রকৃতির মাঝেও ভিন্নতা এবং দ্বন্দ্ব রয়েছে। কিন্তু মূল উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন ভিন্নতা নেই। তা একই।"

একই কিতাবের "আল্লাহ্ কা মশিয়ত" পরিচ্ছেদেও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে যে–

اللہ کی مشیت

دوسرے الفاظ میں حلاج کا مطلب یہ تھا کہ وہ صرف اللہ ہے جو اپنے بندوں پر اپنی مشیت نافذ کرتا ہے اور وہ صرف خدا ہی ہے جو اپنے بندوں کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ فلاں آدمی یہودی ہو، فلاں نصرانی مذہب اختیار کرے اور فلاں مسلمان کے گھر میں پیدا ہو لہٰذا نہ کسی پر معترض ہونا چاہیئے، نہ کسی سے دین کے بارے میں مناظرت کرنی چاہیئے کہ دین سب خدا کے ہیں اور جو شخص جس دین کو اختیار کرتا ہے اس میں بھی خدا کی مرضی اور مشیت شامل ہوتی ہے اور یہ جو اختلاف مختلف ادیان میں نظر آتا ہے یہ اصلی اور جوہری اختلاف نہیں ہے یہ صرف اسم

اور مظہر کا اختلاف ہے ورنہ سچی بات یہ ہے کہ تمام ادیان نام کے اعتبار سے متعدد ہیں۔ حقیقت کے اعتبار سے ایک ہیں، مسمّٰی ایک ہے، اسم جدا جدا ہیں۔ یہ متغائر مظاہر ایک ہی حقیقت ہے ہیں۔ جس طرح حقیقت محمدیہ کے سلسلہ میں حلاج کا نظریہ بعد کو دوسرے لوگوں نے قبول کیا اسی طرح وحدت ادیان کے معاملہ میں بھی منصور حلاج کے نظریہ کی تائید و تقلید بعد کے دوسرے اکابر مثلاً محی الدین ابن عربی، اور عمر بن الفارض اور جلال الدین رومی اور عبدالکریم الجیلی اور دوسرے بہت سے سر برآوردہ اور سرآمدہ روزگار صوفیا اور علماے کی۔ شعراء نے اپنے اشعار میں، اور مصنفین نے اپنی تصنیفات میں اس نظریہ کو سراہا اور اسے تسلیم کر کے اس کی توثیق اور تائید کی۔ اس نظریہ نے اسلام کی حیات روحیہ کی تاریخ پر گہرا اور دیرپا اثر ڈالا۔

অনুবাদঃ "অন্যান্য শব্দসমূহের মধ্যে হাল্লাজের উদ্দেশ্য ছিল যে, একমাত্র আল্লাহ্ই যিনি আপন বান্দাদের উপর নিজের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটান। আর এটা খোদায়ীভাবেই হয়। তিনি আপন বান্দাদের মাঝে ফায়সালা করেন যে, অমুক আদমী ইহুদি হবে, অমুক নাসারা মজহাবের হবে, অমুক মুসলমানের ঘরে জন্ম নিবে। তাই না কারও মাঝে দ্বন্দ্ব হওয়া উচিত, না কোন ধর্ম নিয়ে বিতণ্ডায় লিপ্ত হওয়া উচিত? কেননা সকল ধর্ম খোদার। এবং যে ব্যক্তি যে ধর্মই গ্রহণ করুক না কেন তাতে খোদার সন্তুষ্টি এবং ইচ্ছা নিহিত থাকে। বিভিন্ন ধর্মের মাঝে যে এখতেলাফ দেখা যায় এটা মৌলিক এবং প্রকৃত মতানৈক্য নয়। বরং তা বাহ্যিক মতবিরোধ। সত্য কথা এই যে, যত ধর্ম রয়েছে তা নামের কারণে বিভিন্ন হয়েছে। প্রকৃত অর্থে এক। এই বিভিন্নতা বাহ্যিক, মূল কিন্তু একই। যেভাবে হাকিকতে মোহাম্মদীর পরম্পরা বিষয়ে মনসুর হাল্লাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তীতে অন্যান্যরাও গ্রহণ করেছে একইভাবে ওয়াহ্দাতুল আদ্ইয়ানের ব্যাপারেও মনসুর হাল্লাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তী অন্যান্য আকাবেরগণ সমর্থন এবং অনুসরণ করেন। যেমন মুহিউদ্দিন ইবনু আরাবী, ওমর ইবনে ফারেদ, জালালুদ্দিন রূমি, আব্দুল করিম জিলী এবং অনেক উচ্চমার্গীয় অভিজাত সুফি, পণ্ডিত, উলামা, শায়েরগণ তাঁদের কবিতায়, গ্রন্থকারগণ তাঁদের গ্রন্থে এই তত্ত্বের প্রশংসা করেছেন এবং এটাকে সমর্থন ও এর বৈধতা স্বীকার করেছেন। এই তত্ত্বটি ইসলামের রূহানী জিন্দেগীর ইতিহাসে গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল।"

বর্তমান সময়ে তাওহিদে আদ্ইয়ানের ভিত্তিতে সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। একটা সময় ছিল, যখন যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত ছিল না। তখনকার মানুষ পৃথিবী সম্পর্কে এতো বেশি কিছু জানত না। সাধারণ মানুষ নিজের এলাকার চারপাশের সমাজ-সংস্কৃতি ভিন্ন সমগ্র পৃথিবীর বিচিত্র সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্মবিশ্বাস, আচার-অভ্যাস, জীবনধারা সম্পর্কে পরিচিত ছিল না। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সভ্যতার উৎকর্ষতার এই যুগে আমরা সবাই Global Village তথা বিশ্বগ্রামে বসবাস করছি। অর্থাৎ এক গ্রামে বসবাস করার মতো বাস করছি। বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীকে একটি গ্রামের সাথে তুলনা করা হচ্ছে। একটি গ্রামের প্রত্যেকটি মানুষ যেমন একে অপরের সাথে সংযুক্ত (Connected) থাকে, ঠিকএকইভাবে সারা বিশ্বের প্রত্যেকটি মানুষ কোন না কোনভাবে সবার সাথে সংযুক্ত। পৃথিবীর কোন প্রান্তে কখন কী ঘটছে তা আমরা মুহূর্তেই জেনে যাচ্ছি। আবার ঘটনাগুলো জানার পর মানুষের মাঝে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ারও সৃষ্টি হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে পৃথিবীর সকল প্রান্তের মানুষের জীবনধারা, সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্মীয় আচার-বিশ্বাস ইত্যাদি ভেসে বেড়াচ্ছে আমাদের চোখের সামনে। নানান ধর্ম-বর্ণ-মত-পথের মানুষের দেখা মিলছে। প্রযুক্তির অবারিত গতির সাথে তাল মিলিয়ে সমাজ সংস্কৃতি, আচার অনুষ্ঠান, ধর্মীয় রীতি-নীতিরও রূপান্তর ঘটছে দ্রুত। এ ধরনের নানা প্রকৃতির সমন্বয়ে গঠিত বহুত্ববাদী একটি সমাজে আমাদের বসবাস। **বহুত্ববাদী সমাজে বসবাস করতে হলে নিজের মতাদর্শের প্রতি যেভাবে নিষ্ঠাবান থাকতে হয় ঠিক অনুরূপভাবে ভিন্ন মতাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবোধও রাখতে হয়। নিজ বুঝ ব্যবস্থাকে চরম সত্য মনে করে অন্যের আচরিত সত্যের সঙ্গে দ্বন্ধে লিপ্ত হয়ে কিংবা বিতর্ক করে বহুত্ববাদী সমাজে টিকে থাকা অসম্ভব। কেননা প্রযুক্তির এই অবারিত গতির ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর কোন প্রান্তের কোন সংখ্যালঘু (Minority) জনগোষ্ঠীর উপর যদি অন্যায়, উগ্র আচরণ কিংবা বিশ্বাসজনিত বিষয়ে আঘাত করা হয়, তবে অন্য প্রান্তে যেখানে তারা সংখ্যাগুরু (Majority) সেখানে অপর সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপর এর বিরূপ প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা প্রায় শতভাগ। যেমন, কোন খ্রিস্টান সংখ্যাগুরু রাষ্ট্রে যদি কোন মুসলমানের উপর উগ্রতা প্রদর্শন করা হয়, তবে মুসলিম সংখ্যাগুরু রাষ্ট্রে খ্রিস্টানদের উপর এর একটা**

বিরূপ প্রভাব পড়বে। একইভাবে কোন মুসলিম সংখ্যাগুরু রাষ্ট্রে হিন্দু ধর্মাবলম্বীর উপর উগ্রতা প্রদর্শন করা হলে, তবে হিন্দু সংখ্যাগুরু রাষ্ট্রে মুসলমানদের উপর এর একটা বিরূপ প্রভাব পড়বে। সাম্প্রতিককালের বিভিন্ন ঘটনাপঞ্জি এর বাস্তব দৃষ্টান্ত। এতে আন্তঃমতাদর্শের মাঝে সংঘাত-সংঘর্ষের পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায়। ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিনষ্ট হয়। বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে সারা পৃথিবীব্যাপী যতগুলো সংঘাতপূর্ণ বিষয় জিয়ে আছে সবগুলোর নেপথ্যে মতাদর্শিক দ্বন্দ্বের বীজ নিহিত। গ্রামের মসজিদ-মন্দির কমিটির ঝগড়া হতে শুরু করে আন্তর্জাতিক ফিলিস্তিন-কাশ্মীর ইস্যু পর্যন্ত, এমনকি চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মাঝেও মতাদর্শিক দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। আর এসব দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটবে তখন, যখন "তাওহিদে আদ্‌ইয়ান" ভিত্তিক চিন্তাধারা সমাজে প্রতিষ্ঠা করা যাবে। কেননা তাওহিদে আদ্‌ইয়ান তত্ত্বের মর্মবাণী হলো আন্তঃধর্ম বা মতাদর্শের মধ্যে যে বিষয়গুলো মিল রয়েছে সেগুলোর ভিত্তিতে পারস্পরিক সৌহার্দপূর্ণ একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা। তাই বর্তমান মতাদর্শ কেন্দ্রিক দ্বন্দ্বে উত্তেজিত এই বিশ্বে শান্তির ফোয়ারা আনয়নে তাওহিদে আদ্‌ইয়ান শ্রেষ্ঠতম একটি ফর্মূলা। কারণ এই ফর্মূলা স্বয়ং স্রষ্টা প্রদত্ত। এই ফর্মূলার মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ্ (দ.) বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ইয়াসরিবকে 'শান্তির নগরী মদিনা'য় রূপান্তরিত করেছেন। এই ফর্মূলার ব্যবহারে মুসলমানদের 'ফাতহুম মুবীন' এসেছে এবং সুফিয়ায়ে কেরাম যেখানেই গমন করেছেন সেখানেই প্রশান্তির সমীরণ বইয়ে দিয়েছেন। এদিকে আবার অতিমাত্রায় বস্তুবাদী চিন্তা-ভাবনা এবং ধর্মান্ধ কতিপয় ব্যক্তির উগ্রবাদী এবং সহিংস আচরণকে ধর্ম মনে করে নতুন প্রজন্ম ভিন্ন পথে ধাবিত হয়ে যাচ্ছে এবং দিন দিন নাস্তিক্যবাদের প্রসার ঘটছে। যা প্রত্যেক ধর্মাচারীদের জন্য বর্তমানে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় স্রষ্টা বিশ্বাসী প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদের সমন্বিত একটি প্লাটফর্ম সময়েরই একটি মৌলিক চাহিদা (Demand of Time)।

তাওহিদে আদ্‌ইয়ান প্রসঙ্গে একটি ভুল ধারণার অপনোদন

অনেকেই বিবেচনার সীমাবদ্ধতা, দৃষ্টিভঙ্গিজনিত ত্রুটি কিংবা বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব থেকে তাওহিদে আদ্‌ইয়ান Concept-কে সম্রাট আকবর প্রবর্তিত 'দ্বীনে ইলাহি'র সাথে মিলিয়ে ফেলেন। অথচ এ দুয়ের মাঝে যোজন যোজন দূরত্বেও কোন মিল বা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই তাদের বিভ্রান্তি নিরসন কল্পে এ দুয়ের পার্থক্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো−

ক. সম্রাট আকবর তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সকল ধর্মের কিছু কিছু নিয়ে সম্পূর্ণ নতুন একটি ধর্ম প্রবর্তন করেন। এই ধর্মের কালেমা, ইবাদত, সম্ভাষণ পদ্ধতি সম্পূর্ণ নতুন। কিন্তু তাওহিদে আদ্‌ইয়ান এটি কোন ধর্ম নয়। 'তাওহিদে আদ্‌ইয়ান' তত্ত্বটি শুধুমাত্র বিভিন্ন ধর্ম-মত-গোত্র-সম্প্রদায়ের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মদিনা সনদের আদলে আন্তঃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার একটি ফর্মূলা মাত্র।

খ. দ্বীনে ইলাহি পবিত্র কুরআনের কোন নীতির আলোকে প্রণীত হয়নি। পক্ষান্তরে তাওহিদে আদ্‌ইয়ানের মূল ভিত্তিই হলো পবিত্র কুরআন, রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র জীবনাদর্শ, সাহাবায়ে কেরাম এবং সুফিয়ায়ে কেরামের শিক্ষা। যা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে।

গ. দ্বীনে ইলাহি ধর্ম গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে প্রথমে তার নিজের ধর্ম বিসর্জন দিতে হয়। কিন্তু তাওহিদে আদ্‌ইয়ানের ক্ষেত্রে আপন ধর্ম বিশ্বাস বিসর্জন দেওয়ার

প্রশ্নই উঠে না। বরং প্রত্যেকেই আপন আপন ধর্ম পালন করবে। আর বিভিন্ন ধর্মের মধ্যকার বিশ্বাসগত অভিন্ন বিষয়গুলোকে সূত্র ধরে পারস্পরিক সৌহার্দ এবং শান্তিপূর্ণ বিশ্ব নির্মাণে সংঘবদ্ধ ভূমিকা পালন করবে।

ঘ. দ্বীনে ইলাহির অনুসারীদের নতুন কালেমা নির্ধারণ করা হয়েছিল "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আকবর খলিফাতুল্লাহ্"। আর তাওহিদে আদ্‌ইয়ান যেহেতু কোন ধর্মই নয়, সুতরাং এক্ষেত্রে নতুন কালেমার প্রশ্নই অযৌক্তিক। অতএব এক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য তাঁদের কালেমাই আছে এবং থাকবে– "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)"।

ঙ. দ্বীনে ইলাহিতে সালামের (সম্ভাষণ) পরিবর্তন ঘটানো হয়েছিল। সেখানে সালামের পরিবর্তে বলা হতো– 'আল্লাহু আকবর' উত্তরে বলা হতো– 'জাল্লা-জালালুহু'। অপরদিকে তাওহিদে আদ্‌ইয়ান তত্ত্বের ভাষ্য হলো– প্রত্যেকেই আপন আপন ধর্মের রীতি অনুসারে সম্ভাষণ করবে। সুতরাং মুসলমানদের সম্ভাষণ পদ্ধতি হলো– 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্' উত্তরে 'ওয়ালাইকুমুস্ সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু'।

চ. দ্বীনে ইলাহিতে নতুন ইবাদত পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু তাওহিদে আদ্‌ইয়ানের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোন বিষয় নেই। প্রত্যেকেই আপন আপন ধর্ম অনুসারেই ইবাদত করবে এটাই তাওহিদে আদইয়ানের ভাষ্য। এই আলোকে মুসলমানরা আপন ধর্মের নিয়ম নীতি অনুসারে ইবাদত বন্দেগী করবে।
সুতরাং আশা করি, যাঁরা নিজেদের ধারণাগত সীমাবদ্ধতার কারণে কুরআন, হাদিস, সাহাবায়ে কেরাম এবং সুফিয়ায়ে কেরামের জীবন দর্শনে অবলম্বিত বিষয় তাওহিদে আদ্‌ইয়ানকে সম্রাট আকবরের দ্বীনে ইলাহির সাথে মিলিয়ে ফেলেন, তাঁরা উপর্যুক্ত পার্থক্যগুলো অনুধাবনে সচেষ্ট হবেন।

ধনঞ্জয় বড়ুয়ার ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গ

[বেলায়তে মোত্‌লাকাঃ পৃষ্ঠা- ১০৪, তৃতীয় প্রকাশের পুনঃপ্রকাশ]

মানুষ কেন ধর্ম গ্রহণ করে? সেটা এজন্য যে, যেন ক্বলবকে (অন্তর) পরিশুদ্ধ করার মধ্য দিয়ে এটিকে সম্পূর্ণভাবে স্রষ্টা তথা মহান রাব্বুল আলামিনের দিকে ধাবিত করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় এবং এর মাধ্যমে নিজের জীবন-মরণকে অর্থবহ করে তোলা যায়। এজন্য ধর্মে নানান প্রকার ইবাদত-উপাসনার পদ্ধতি থাকে। অনুরূপভাবে ইসলাম ধর্মেও রয়েছে বহুরকম। তবে এক্ষেত্রে একটি মৌলিক শর্ত হলো, নিজের ক্বলবের অবস্থান সম্পূর্ণভাবে ঠিকঠাক রাখা। অর্থাৎ, ইবাদতের মধ্যে ক্বলব শুধু স্রষ্টার দিকেই ধাবিত হয়ে থাকতে হবে। আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, ইবাদতের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে হবে স্রষ্টার সন্তুষ্টি। আর যতক্ষণ পর্যন্ত এই 'নীতি'তে আসা সম্ভব হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার ইবাদত কবুল বা গৃহীত বলে গণ্য হবে না। একটু সচেতনভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, নামাযে বান্দাকে একাগ্রচিত্তে দাঁড়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, রোযার বিধান দেওয়া হয়েছে যাতে বান্দা মোত্তাকি (এক আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত) হতে পারে, কুরবানীর বিধানে সুস্পষ্টভাবে মহান রাব্বুল আলামিন সাবধান বাণী দিয়ে রেখেছেন– বান্দার কুরবানীর রক্ত-মাংস আল্লাহ্‌র দরবারে পৌঁছে না, পৌঁছে শুধু বান্দার ক্বলবের উদ্দেশ্য ইত্যাদি। ইসলাম তথা শরিয়তে মোহাম্মদীর প্রাথমিক যুগে এক ধরনের মোনাফিক ছিল যারা মুখে মাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিল, অন্তরে নয়। তারা গোপনে মুসলিম সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যেই মূলত এমনটা করেছিল। তাহলে তারা কি প্রকৃত মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে? – কখনোই না! বিপরীতে (তাও ইসলামের প্রাথমিক যুগের) এমন বহু ঘটনাও আমাদের জানা

রয়েছে, কিছু মানুষ গোপনে আল্লাহ্‌র রাসুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামার প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা-ভালবাসা পোষণ করতেন, রাসুল হিসেবে বিশ্বাস রাখতেন, মহান রাব্বুল আলামিনের তাওহিদ বা একত্ববাদে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতেন। কিন্তু পরিস্থিতির প্রতিকূলতার কারণে সামাজিকভাবে নিগৃহীত হওয়া বা প্রাণনাশের আশংকায় তাঁরা প্রকাশ্যে এসে ইসলাম গ্রহণ করতে বা গৃহীত ইসলাম প্রকাশ করতে পারেননি। উদাহরণ হিসেবে বলতে গেলে, বাদশা নাজ্জাশীর ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার ঘটনাটি কে না জানে!

সুতরাং সুস্পষ্ট যে, ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে বা ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর ইবাদত-উপাসনা করার ক্ষেত্রে 'বান্দার অন্তরের অবস্থান কী, তার অন্তর মূলত কোনদিকে ধাবিত' সেটাই মুখ্য বিষয়।

আল্লাহ্‌র রাসুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম একজন রাসুল হিসেবে, বিশেষত সাইয়িদুল মোরসালিন হিসেবে মানুষের অন্তরের অবস্থান জানা বা স্বচক্ষে দেখা, এককথায় অন্তর্যামী হওয়া তাঁর জন্য অতি স্বাভাবিক বিষয়। একইভাবে মহান রাব্বুল আলামিনের আউলিয়ায়ে কেরাম বিশেষত 'গাউসুল আযম' পর্যায়ের একজন অলিউল্লাহ্‌ 'নায়েবে রাসুল (রাসুলের দুনিয়াবী ও রূহানী উত্তরসূরি)' হিসেবে মানুষের অন্তরের অবস্থান স্বচক্ষে দেখবেন বা জেনে থাকবেন– এটাই স্বাভাবিক। আল্লাহ্‌র রাসুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম যেমন মানুষের অন্তরের অবস্থান দেখে তাকে মোনাফিক বা মুমিন সাব্যস্ত করেছেন, তার থেকে সাবধান হয়েছেন কিংবা সাথে নিয়ে নিয়েছেন একইভাবে একজন অলিউল্লাহ্‌ও 'নায়েবে রাসুল' হিসেবে ঠিক এমনটাই করবেন– এটাই তো স্বাভাবিক, তাইনা!

ঠিক এমনই একটি উদাহরণ হলো, এই নিবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র একজন ভক্ত ধনঞ্জয় বড়ুয়ার ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়া বিষয়ক ঘটনাটি। নিম্নে বেলায়তে মোত্‌লাকা গ্রন্থে বর্ণিত ধনঞ্জয় বড়ুয়া সংক্রান্ত বক্তব্যটি তুলে ধরা হলো–

"ধনঞ্জয় নামে তাঁহার এক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ভক্ত জাহেরী জবানীতে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইতে চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন, 'তুমি তোমার ধর্মে থাক, আমি তোমাকে মুসলমান করিলাম'।" [বেলায়তে মোত্‌লাকা, নবম পরিচ্ছেদ]

সুপ্রিয় সচেতন পাঠক, ঘটনাটিকে উপর্যুক্ত পর্যালোচনার ছাঁচে ফেলে দেখুন, পরিষ্কার হয়ে ধরা দেবে চোখের সামনে। তারপরও প্রসঙ্গক্রমে আর দুয়েকটি কথা বলতে হয়–

ঘটনাটি বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে, "...জাহেরী জবানীতে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইতে চাহিলে...।" এর মাধ্যমে সুস্পষ্ট যে, তিনি বাতেনীভাবে বা অন্তরের দিক থেকে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস অর্থাৎ স্রষ্টার ক্ষেত্রে তাওহিদ (একত্ববাদ) এবং রাসুলসহ ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্বাসী ছিলেন, ইসলাম ধর্মের নীতির উপরই ছিলেন। যা 'বেলায়তে মোত্‌লাকা' কিতাবের ঘটনা সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছেদটি অনুধাবন করার চেষ্টা করলে আরও স্পষ্ট হয়ে যাবে। তবে এক্ষেত্রে একজন মুসলিম হিসেবে ইনসাফ তথা নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখতে হবে।

এখানে আরেকটি দিক বিশেষভাবে উল্লেখ করার দাবিদার– একজন মানুষ ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে তাকে সমাজ থেকে বিতাড়িত হওয়া ছাড়াও আরও কত সমস্যা-প্রতিকূলতার শিকার হতে হয়, বাস্তব জীবনে নদীর কতটা ফাটল ধরা তীরে বসবাস করতে হয়, কতভাবে জীবন-নাশের আশংকা সৃষ্টি হয়ে যায়– তা ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝে ওঠা অসম্ভব, যতক্ষণ পর্যন্ত ধর্মান্তরিত ব্যক্তিটির সেই অবস্থানে নিজেকে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড় করিয়ে বুঝার বা অনুধাবন করার চেষ্টা করা হবে না।

আর এই সব দিক বিবেচনায় রেখে আল্লাহ্‌র রাসুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামার অনুসরণে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) কেমন পর্যায়ের 'হেকমত' (প্রজ্ঞা) অবলম্বন করেছেন মানুষকে আলোর দিশা দেওয়ার ক্ষেত্রে, তা একজন সচেতন বান্দার জন্য দারুণভাবে চিন্তার খোরাক জোগায়। যেই হেকমতের নির্দেশনা মহান রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনেই সুস্পষ্টভাবে দিয়ে রেখেছেন। আল্লাহ্‌ পাক বলেন,

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

অর্থ: "ভাল উপদেশ এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ উপায়ে তোমরা প্রভুময় পথে আহ্বান কর" [সূরা নাহল: আয়াতাংশ-১২৫]।

মূলত মহান রাব্বুল আলামিন তাঁর যে বান্দাকে যতটা গভীর প্রজ্ঞা (হেকমত) দান করেছেন, তিনি ততটা গভীর প্রজ্ঞা ব্যবহার করেই পৃথিবীতে দাওয়াতী/তাবলিগী (সত্যের/ধর্মের প্রচার) কাজ সম্পাদন করবেন।

সারকথা এই, মহান রাব্বুল আলামিন সময়ের বাস্তবতা, পরিবেশ-পরিস্থিতি এ সবকিছু বিবেচনা করে যুগে যুগে মানুষকে তাঁর একত্ববাদের দিকে, সত্যের আলোর দিকে 'ধাপে ধাপে' এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর প্রেরিত মহাপুরুষ নবি-অলিগণের মাধ্যমে বহু ধরনের হেকমত অবলম্বন করেছেন এবং করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর এমন সহনশীল মানসিকতা পোষণ করা প্রতিটা বান্দার জন্যও একান্ত অপরিহার্য।

পৃথিবী পরিব্যাপ্ত শিরক ও নাস্তিকতাবাদের আওতা হইতে মানব জাতিকে সোজাসুজি "আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের" মুসলমান করিয়া লওয়ার ভাবধারাকে ইতিহাস বাস্তব ক্ষেত্রে অবান্তর প্রমাণিত করিয়াছে

[বেলায়তে মোত্লাকা: পৃষ্ঠা- ৭২, তৃতীয় প্রকাশের পুনঃপ্রকাশ]

অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) বর্তমান বিশ্ব সমাজ ব্যবস্থার আচরণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন সেগুলো হলো–

ক. স্তুপাকার বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ: জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোয় আলোকিত এই বিশ্বসমাজে যে কোন বিষয় সম্পর্কে জেনে নেওয়ার সহজ এবং সর্বোত্তম মাধ্যম হলো বই। তাই বইয়ের মাধ্যমে অধিকাংশ মানুষ অজানা সম্পর্কে জানে। অজানা কোন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য কোন একজন উৎসাহী পাঠক ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থের শরণাপন্ন হয়ে যখন অভিন্ন মতামত কিংবা প্রায় কাছাকাছি মতামত দেখতে পায় তখন উক্ত বিষয়ের সঠিকতা সম্পর্কে পাঠকের অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থা জন্মে।

আবার যদি এর উল্টো হয়, অর্থাৎ একই বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থে সম্পূর্ণ বিপরীত, এমনকি সাংঘর্ষিক মতামত দৃশ্যমান হয় তখন উক্ত বিষয় সম্পর্কে সন্দেহের দানা বাঁধে এবং সঠিক বিষয়টা বের করে আনা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। বর্তমানে এই চরম বাস্তবতার মুখোমুখি হচ্ছে ইসলাম ধর্ম। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কেউ যদি ইসলাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয় তখন তার চোখের সামনে ভাসতে থাকে কুরআন, হাদিস, আক্বিদা, মাযহাব, ত্বরিকত ইত্যাদির উপর লিখিত হাজার হাজার ব্যাখ্যাগ্রন্থ। এই ব্যাখ্যা গ্রন্থগুলোতে একেক বিশ্লেষক একই বিষয়ে আপন আপন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। এতে করে একটি বিষয়ের উপর নানামুখী মতবাদের উদ্ভব ঘটেছে। আবার একই বিষয়ে বিপরীত মতামত, সাংঘর্ষিক মতামত তো আছেই। এমনকি আপন মতামতের বিপরীত অপরাপর মতামতকে বাতেল-ভ্রান্ত, শিরকী কিংবা কুফরী মতবাদ বলেও আখ্যা দেওয়া আছে। যা জ্ঞানচর্চা-দার্শনিকতার বিচারে সঙ্গত হলেও ইসলাম সম্পর্কে জানতে উৎসুক কোন পাঠকের এই অসংখ্য মতবাদের জঙ্গল থেকে ধর্মের প্রকৃত ডাক হৃদয়ঙ্গম করা বাস্তব ক্ষেত্রে দুঃসাধ্য হয়ে ঠেকেছে।

খ. বৈজ্ঞানিক ভাবধারা যুক্তির বেড়াজাল: একুশ শতকের বিজ্ঞানের চরম উন্নতির এই যুগে প্রতিটি কাজের পেছনে মানুষ যুক্তি তালাশ করে। এটি হচ্ছে যুগবিবর্তনের বাস্তবতা। এই বাস্তবতাকে সরাসরি উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। কিন্তু ধর্মের একান্ত মৌলিক বিষয়গুলো যুক্তিভিত্তিক নয়, বরং বিশ্বাস নির্ভর। যুক্তির বিচারে এই বিষয়গুলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করা হলে তল-কূল পাওয়া অসম্ভব। অতি যুক্তিবাদীরা বিশ্বাসগত বিষয়গুলোকে যুক্তির মানদণ্ডে বিচার-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে। ফলে তাদের কাছে ধর্মের মৌলিক বিষয়গুলো অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক মনে হয়। তাই তারা ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে নানা যুক্তি দেখায় এবং এর প্রভাবে সাধারণ মানুষদেরও অনেকেই ধর্মহীনতার দিকে ঝুঁকে পড়ে।

গ. বস্তুবাদ: বস্তুবাদ পার্থিব বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু ধর্ম পার্থিব এবং পারলৌকিক উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই ধর্মকে শুধুমাত্র বস্তুবাদের সংজ্ঞা দিয়ে বিবেচনা করলে ধর্মের মৌলিক বিশ্বাসসমূহ এবং রুহানী বিষয়গুলোর বাস্তবতা ও যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। কেননা বস্তুবাদ শুধুমাত্র দৃশ্যমান বস্তুকে স্বীকার

করে, অদৃশ্য বস্তুকে নয়। আর ধর্মীয় বিশ্বাসের অনেক বিষয় জাগতিক দৃষ্টি বহির্ভূত তথা অদৃশ্য। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই অনন্ত, অসীম, সদা কর্মতৎপর অথচ অদৃশ্য। এই অদৃশ্য স্রষ্টার উপর ঈমান তথা বিশ্বাস আনাই হলো ধর্মের প্রথম এবং প্রধান নির্দেশ। কিন্তু দিনদিন মানুষ অতিমাত্রায় বস্তুবাদী হয়ে পড়ছে। মাত্রাতিরিক্ত বস্তুবাদী চিন্তা-ভাবনা মানুষকে আবেগ-অনুভূতিহীন রোবটিক যন্ত্রে পরিণত করছে। এখন মানুষ উপস্থিত লাভ-ক্ষতির বিষয়টিই প্রথমে চিন্তায় আনে। জীবন-জীবিকা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার দৌড়ে ব্যতিব্যস্ত অধিকাংশ ধর্মানুসারী মানুষও ধর্মীয় বিষয়গুলোকে ঐচ্ছিক হিসেবে বিবেচনা করছে কিংবা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব দিচ্ছে। উপরন্তু ধর্ম এবং কর্মকে ভিন্ন ভিন্ন দুটো জগৎ হিসেবে ধারণায় নিয়ে আসার কারণে কর্মের মাঝেই ধর্ম অনুশীলনের বিষয়টি উপেক্ষিত হয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। ফলে ধর্মের নৈতিকতা, শিক্ষা, সততা, জবাবদিহিতা এবং পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য যে নির্দেশনা ধর্মীয় গ্রন্থে বার বার আলোচিত হয়েছে, সেই বিষয়গুলো কর্মজীবনে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। অতিরিক্ত ভোগবাদী চিন্তা-ভাবনার ফলে মানুষ দিন দিন যেভাবে বস্তুবাদী হয়ে পড়ছে এবং গ্রন্থ ভাণ্ডারগুলোও বস্তুবাদ প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ছে তাতে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের পক্ষে ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য বুঝতে পারা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঘ. নাস্তিক্যবাদঃ বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অস্বীকার তথা নাস্তিক্যবাদের সম্প্রসারমাণ পরিব্যাপ্তি। দিন দিন নানা যুক্তি-ব্যাখ্যার মাধ্যমে স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকারের চেষ্টা করা হচ্ছে। আবার সুন্দর বইয়ের মোড়কে এবং বক্তব্যের মাধ্যমে যুক্তি-ব্যাখ্যাগুলো ছড়িয়ে দিয়ে এই মতবাদ সমানতালে প্রচার করা হচ্ছে। বস্তুবাদের জাগতিকতা এবং ভোগবাদী লিপ্সার কারণে নাস্তিক্য মতাদর্শের প্রতি মানুষ কী হারে ঝুঁকে পড়ছে তা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নাস্তিকদের ক্রমোন্নত পারিসংখ্যানিক তথ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেই বুঝা যায়।

নিম্নে ১৯০০ হতে ২০০০ সাল পর্যন্ত আব্রাহামিক ধর্ম এবং নাস্তিকদের একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো–

ধর্ম	১৯০০ সাল		২০০০ সাল	
	অনুসারী	জনসংখ্যা অনুসারে (হার)	অনুসারী	জনসংখ্যা অনুসারে (হার)
মুসলিম	১৯,৯৯,৪০,৯২৪	১২.৩%	১১৮,৮২,৪২,৭৮৯	১৯.৬%
খ্রিস্টান	৫৫,৮১,৩১,৫৭২	৩৪.৫%	১৯৯,৯৫,৬৩,৮৩৮	৩৩%
ইহুদি	১,২২,৯২,২১০	০.৮%	১,৪৪,৩৪,০৩৯	০.২%
নাস্তিক	২,২৬,১২০	০.০১%	১৫,০০,৮৯,৫০৮	২.৫%

তথ্য সূত্র: ভিক্টোরিয়া এস হ্যারিসন, অধ্যাপক, ধর্মদর্শন বিভাগ, ম্যাকাও বিশ্ববিদ্যালয়

এই পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট যে, ১৯০০ সালে সমস্ত পৃথিবীতে নাস্তিকের সংখ্যা ছিল মাত্র ২ লাখ ২৬ হাজার ১২০ জন। পরবর্তী একশ বছরের মধ্যে নাস্তিকদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫ কোটিরও উপরে। উপর্যুক্ত পরিসংখ্যান থেকে ধারণা করা যায় তুলনামূলক হারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অতি দ্রুতই নাস্তিকতার প্রসার ঘটছে। উপরন্তু ২০২২ সালে এসে উইকিপিডিয়ার তথ্য মতে সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যার ৭% নাস্তিক্যবাদে আস্থাশীল। অর্থাৎ প্রায় ৮০০ কোটি জনসংখ্যার এ পৃথিবীতে নাস্তিক্যবাদীর সংখ্যা প্রায় ৫৬ কোটি।

নাস্তিক্যবাদীদের যুক্তিগুলো যে অকাট্য তা কিন্তু নয়। কিন্তু তারপরও নাস্তিক্যবাদের দিকে মানুষ ঝুঁকে পড়ার বেশ কয়েকটি কারণ আছে। তৎমধ্যে কতিপয় কারণ হলো –

১. ধর্মকে শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক ভাবধারায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টা মানুষকে ক্ষেত্রবিশেষে ধর্মের প্রতি অনাস্থাশীল করে তুলছে, এমনকি সেই অনাস্থা মানুষকে নাস্তিকতাবাদের দিকেও ঝুঁকিয়ে দিচ্ছে। ধর্ম যতটা না 'বৈজ্ঞানিক' তার চেয়ে অনেক বেশি 'আধ্যাত্মিক'। কিন্তু বর্তমান সময়ের অধিকাংশ স্কলার আলোচনার মঞ্চে কিংবা লেখনিতে ইসলামকে শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক ধর্ম প্রমাণে জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এতে তাঁরা নিজেরাই মনের অজান্তে ইসলামের অনেক মৌলিক

বিষয়কে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন। কেননা অদৃশ্যে বিশ্বাস, ভাববাদ, অধ্যাত্মবাদ এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক যুক্তির সমন্বয়েই ইসলাম ধর্ম। মূলত ইসলামের সব বিষয় বিজ্ঞানের সূত্রে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। যেমন, মানুষের কাঁধে যে ফেরেশ্‌তা আছে সেটা আমাদের বিশ্বাস, কিন্তু বিজ্ঞানের সূত্র দিয়ে তা প্রমাণ করা যায় না। ইসলামের নিদর্শন সম্বলিত স্থানসমূহ, মক্কা-মদিনা, নবি এবং আল্লাহ্‌র অলিগণের মাজার জেয়ারতের মাধ্যমে আমাদের মন প্রশান্ত হয়, এটা হলো রুহানিয়্যতের প্রভাব। কিন্তু বিজ্ঞানের সূত্রের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তাই আমরা যখন ইসলামকে 'শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক ধর্ম' হিসেবে প্রমাণ করতে যাই তখন 'বিশ্বাসগত, ভাবগত এবং আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো' দৃষ্টির অগোচরে থেকে যায়। পরন্তু এগুলো বিজ্ঞানের মানদণ্ডে বিশ্লেষণ করলে যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলে অনেকেই এই বিষয়গুলো নিয়ে নানা প্রশ্ন এবং বিরূপ মন্তব্য করার সুযোগ পায়। এতে অনেকের মনে ইসলামের প্রতি সন্দেহের সৃষ্টি হয় এবং এক পর্যায়ে মানুষ ধর্মহীন এমনকি নাস্তিক পর্যন্ত হয়ে যায়।

২. শত শত বছর পূর্বেকার বিশ্বব্যবস্থার আলোকে প্রণীত মুসলিম স্কলারদের গবেষণালব্ধ আইন কানুন এই পরিবর্তিত বিশ্ব সমাজে বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা ইসলামকে গতিহীন, স্থবির করে তুলেছে। এতে চিন্তাশীল বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজের অনেকেই ধর্মহীনতার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। কেননা শত শত বছর পূর্বের বিশ্ব সমাজ ব্যবস্থা এবং বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানে চরম উন্নীত বিশ্ব সমাজ ব্যবস্থার মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। তৎসময়ের বাস্তবতা এবং এই সময়ের বাস্তবতার মাঝেও রয়েছে বিশাল তফাৎ। তখন ছিল কৃষিভিত্তিক সমাজ আর এখন মানুষ শিল্পোন্নত সমাজ পেরিয়ে Space Age তথা মহাকাশ যুগের দিকে যাত্রা করছে। তখন রাষ্ট্রের কোন অস্তিত্ব ছিল না, রাজারা রাজ্য বিজয়ের মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থা কায়েম করত। আর এখন সুনির্দিষ্ট সীমানাভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠিত হয়েছে। মানুষের পেশা, জীবনধারা, আচার-আচরণ, চিকিৎসা পদ্ধতি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় বিরাট পরিবর্তন এসেছে। মানুষ নতুন নতুন জটিলতার সম্মুখীন হচ্ছে, যে সমস্যা-ক্ষেত্রগুলোর অস্তিত্ব শত বছর আগে ছিল না। তাই শত বছর আগে প্রণীত আইন-কানুন এই সময়ে এসে অনেক ক্ষেত্রে খোঁড়া। এই খোঁড়া ব্যবস্থাপনা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পরিপূর্ণ সমাধান পাওয়া দুষ্কর। আর

মুসলিমদের একটি অংশ যেহেতু এই পদ্ধতি জোর করে সমাজে বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছে, সেহেতু চিন্তাশীল অনেকের কাছে গোটা ইসলাম ধর্মই হালকা হয়ে পড়ছে। ফলে তারা ধর্মহীনতাকেই বেছে নিচ্ছে। অথচ মুসলিমরা পরিবর্তনের স্রোতের সাথে যাতে নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে পারে এবং কোন এক জায়গায় জমাট বেঁধে না থাকে সেজন্য আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন 'তাজদিদ' এবং 'ইজতিহাদের' মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ দুটো হাতিয়ার দিয়েছেন।

৩. মুসলমানদের একটি শ্রেণির চরম উগ্রতার কারণেও কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষ ইসলাম ধর্ম থেকে বিমুখ হচ্ছে। কারণ তারা ভেবে নিচ্ছে ইসলাম ধর্মের শিক্ষাই হলো উগ্রতা। ইসলামের মূল আবেদনে যে উগ্রতার কোন স্থানই নেই, তা মুসলিমরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেদের আচরণের মাধ্যমে উজ্জ্বলভাবে বিকশিত করতে অনেকাংশে ব্যর্থ হচ্ছে। উপরন্তু, জিহাদের বিকৃত ব্যাখ্যা করে শুধুমাত্র সশস্ত্র যুদ্ধের সাথে এর অর্থকে একিভূত করার মাধ্যমে একশ্রেণির জনগোষ্ঠীর সার্বক্ষণিক যুদ্ধংদেহী মনোভাব জনসাধারণের মাঝে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করছে। তাই ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে ভয় পাচ্ছে। 'ইসলামোফোবিয়া' হলো এর সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত।

৪. নতুন এবং বিচিত্র বস্তুর প্রতি মানুষের স্বভাবজাত একটি আকর্ষণ রয়েছে। এই বাস্তবতার প্রেক্ষিতেও নাস্তিক্যবাদের প্রসার ঘটছে।

৫. অনৈতিক উপায়ে খ্যাতি লাভের মনোবাসনা থেকেও অনেকে নিজেকে নাস্তিক হিসেবে পরিচিত করে তুলছে। ধীরে ধীরে নাস্তিক্যবাদ প্রসার লাভের পেছনে যে কারণগুলো বিদ্যমান রয়েছে এর বিশাল একটি অংশজুড়ে যে ধর্মানুসারীদেরও কিছু সীমাবদ্ধতা এবং অগভীর চিন্তাভাবনা লুক্কায়িত রয়েছে তা সহজেই বুঝা যাচ্ছে।

এই বহুমুখী সমস্যা একজন সত্যসন্ধানী মানুষকে গোলক ধাঁধায় নিপতিত করে সত্য বস্তু খুঁজে নিতে কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি করে দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপর্যুক্ত সমস্যাগুলো অতিক্রম করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করাটা একজন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর জন্য দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। এই তত্ত্বটি যে একেবারে আজগুবি নয় তার উজ্জ্বল প্রমাণ হলো জর্জ বার্নার্ড শ'। তিনি বলেছেন– "আমি কোথায় যাইব? যাহাদিগকে লোকে মুসলমান বলে মুসলমান ও ইসলাম সেই রূপ নহে। ইসলামের সত্যিকার ও মৌলিক সমাজ ব্যবস্থা থাকিলে আমি নিশ্চয়ই সেই

সমাজে যাইতাম।" এই চতুর্মুখী বাধা ডিঙিয়ে ইসলামের পথে আসতে না পারাটা কোন ব্যক্তির শুধুমাত্র বোধগম্যতার সীমাবদ্ধতাই নয় বরং পারিপার্শ্বিক জটিল পরিবেশ ও এর জন্য দায়ী। এরূপ প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ অবস্থায় কেউ যদি উপর্যুক্ত পারিপার্শ্বিক বাধাগুলো ডিঙিয়ে পুরোপুরি ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসগুলো গ্রহণ করে নিতে সক্ষম না হয়, তবে তাকে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা উচিত সেই বিষয়টি চিন্তা করার জন্য বিবেচনার খোরাক দেওয়া হয়েছে 'বেলায়তে মোত্‌লাকা' গ্রন্থে। বলা হয়েছে– "কোন পাহাড়ী ব্যক্তি যাহার নিকট নবির দাওয়াত বা আহ্বান পৌঁছার সুযোগ হয় নাই, তাহার জন্য শুধু এক স্রষ্টা আছে; এইটুকু বিশ্বাসই নাজাতের জন্য যথেষ্ট। কোন নবির উপর ঈমান আনা এবং ধর্মের অন্যান্য নির্দেশাদির জন্য তাহাকে দায়ী করা হইবে না; এই কথা সর্ববাদী সম্মত।" এই বিষয়ে কারোরই দ্বিমত নেই। কেননা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে বলেছেন– وَمَاكُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا **অর্থ:** "আমি রাসুল না পাঠানো পর্যন্ত কাহাকেও শাস্তি দেই না" [সূরা বনি ইসরাইল: আয়াতাংশ-১৫]। এই সর্ববাদী মতামতের আলোকে "এই যুগে স্তুপাকার বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ, বৈজ্ঞানিক ভাবধারা যুক্তির বেড়াজাল, নাস্তিকতা ও বস্তুবাদের মনোরম সাহিত্য ভাণ্ডার হইতে কেহ যদি সঠিক ধর্মের ডাক হৃদয়ঙ্গম করিয়া বাছিয়া লইতে সক্ষম না হয়, তাহাকে কি উক্ত পাহাড়ীয়া ব্যক্তির পর্যায়ভুক্ত করিয়া শুধু তাওহিদ বা একেশ্বরবাদের স্বীকৃতির জন্য দায়ী করা সমীচীন নহে?" (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, বেলায়তে মোত্‌লাকা) অর্থাৎ ধর্মীয় বিষয়ের উপর লিখিত হাজার হাজার গ্রন্থ, বৈজ্ঞানিক ভাবধারায় নানা যুক্তি, নাস্তিক্যবাদ এবং বস্তুবাদের মনোরম সাহিত্য ভাণ্ডার, শত শত চিন্তা-মতবাদের উৎপত্তির কারণে বর্তমান পৃথিবী গহিন অরণ্যের অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে, যেখানে সঠিক পথের সন্ধান জানা মানুষ ব্যতীত অন্যরা সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া অনেকটা দুঃসাধ্য। এই পরিস্থিতি বিবেচনা করে কেউ যদি উপর্যুক্ত বাধাগুলো উপেক্ষা করে সঠিক ধর্মের আহ্বান হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হয়, শুধু মাত্র আল্লাহ্‌র তাওহিদের উপর অটল থেকে সৎকর্ম করে যায় তবে তাকে এই পাহাড়ী ব্যক্তির মতো করে চিন্তা করার অবকাশ আছে কি না তা ভেবে দেখার সেই প্রস্তাবনা উপস্থাপিত হয়েছে বেলায়তে মোত্‌লাকা গ্রন্থে।

এরপর চিরন্তন একটি বাস্তবতা পেশ করা হয়েছে এভাবে– "উপরন্তু পৃথিবী পরিব্যাপ্ত শিরক ও নাস্তিকতাবাদের আওতা হইতে মানব জাতিকে সোজাসুজি "আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের" মুসলমান করিয়া লওয়ার ভাবধারাকে ইতিহাস বাস্তব ক্ষেত্রে অবান্তর প্রমাণিত করিয়াছে।" অর্থাৎ কোন নাস্তিক ব্যক্তি, যে কি না সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বেই বিশ্বাস করে না তাকে এক বৈঠকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের যে আকিদা রয়েছে সেগুলো মানিয়ে নেওয়া অথবা মিলাদ, কিয়াম, উরস, ফাতিহা, এমনকি আজানের আগে দরূদ পাঠ নিয়ে যে মতানৈক্য রয়েছে সেটাও মানিয়ে নেওয়া কখনোই সম্ভব নয়। উপরন্তু কাউকে এই নীতিতে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করা কুরআনিক হেকমত সম্মতও নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

অর্থঃ "ভাল উপদেশ এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ উপায়ে তোমরা প্রভুময় পথে আহ্বান কর" [সূরা নাহলঃ আয়াতাংশ-১২৫]।

এই প্রজ্ঞা অবলম্বনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো– মদ হারাম হওয়ার ঘোষণা প্রসঙ্গটি। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন চাইলেই প্রথম বারেই মদ পান হারাম ঘোষণা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি ধীরে ধীরে তিন ধাপে আয়াত নাজিল করে মদ পান হারাম ঘোষণা করেছেন। এটিই খোদায়ী হেকমত। একইভাবে নাস্তিক কেউ– যে কি না স্রষ্টার অস্তিত্বেই বিশ্বাস করে না তাকে প্রথমে তাওহিদের দাওয়াত দিতে হবে। এরপর ক্রমান্বয়ে ধাপে ধাপে রেসালাতসহ সপ্ত ঈমানের বিষয়গুলোর প্রতি দাওয়াত দিতে হবে। প্রথম বৈঠকেই যদি তাকে আকিদার সূক্ষ্ম দিকগুলোর দাওয়াত দেওয়া হয় তবে সেটা তার ক্ষেত্রে অবান্তর তথা অপ্রাসঙ্গিক ঠেকবে। কেননা, সে তো এখনও তাওহিদের প্রতিই ঈমান আনেনি। আগে তো তাওহিদ, তারপরই তো পর্যায়ক্রমে আক্বিদা। এই চিরন্তন বাস্তবতাটাই বেলায়তে মোত্লাকা গ্রন্থে অত্যন্ত নিরপেক্ষ এবং নির্মোহ দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাযিমী সিজদা

সিজদায়ে তাযিমী যুগে যুগে সুফিয়ায়ে কেরামের দরবার এবং খানকাহ্‌সমূহে আচরিত হয়ে আসছে। এবং এই তথ্য নথিবদ্ধ হয়ে আছে তাসাওউফের অসংখ্য কালোত্তীর্ণ গ্রন্থে। নিম্নে তাসাওউফ ইতিহাসের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ থেকে সে বিষয়ক বর্ণনা উপস্থাপন করা হলো–

গাউসুল আযম শায়খ সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (ক.)'র তাযিমী সিজদা গ্রহণ: কাদেরিয়া ত্বরিকার স্বয়ং ইমামুত্ব ত্বরিকত হুজুর শাহানশাহে বাগদাদ গাউসুল আযম শায়খ সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (ক.)-কে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে সম্মান প্রদর্শন করা তথা তাযিমী সিজদা দেওয়ার প্রচলন তাঁর ভক্ত-মুরিদানের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে হুজুর গাউসে পাকের সর্বাধিক বিশুদ্ধ জীবনী "বাহজাতুল আসরার" গ্রন্থে। যেমন– বাহজাতুল আসরার গ্রন্থের ৩৮-৩৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে–

أخبرنا الشيخ أبو المحاسن يوسف بن أبي المعالي أحمد بن شبيب بن حسين المصري البصري المالكي بالقاهرة سنة تسع وستين وستمائة

قال: أخبرنا الشيخ الفقيه المقري العدل أبو طالب عبد الرحمن بن أبي الفتح محمد بن أبي المظفر عبد السميع بن عبد الله القرشي الهاشمي الواسطي بها سنة عشرين وستمائة

قال: حضرت بالبصرة وأنا صبي مع والدي أبي الفتح عند الشيخ القدوة أبي محمد بن عبد الله البصري، وكان يتكلم على أصحابه فقطع

كلامه وسها ساعة وسكت كل من كان حاضراً إجلالاً له، ثم وضع رأسه على الأرض، وقال: على رأسي، فلما دخل داره دخل أبي معه وأنا خلفهما فقال له أبي وكان يدل عليه: يا سيدي بحق العزيز إلا ما أخبرتني بسبب هذا الفعل والقول اللذين رأيناهما منك فقال: قد قال الشيخ عبد القادر اليوم ببغداد : قدمي هذه على رقبة كل ولي الله، ولم يبق ولي في الأرض حتى فعل مثل ما رأيتني فعلت

অনুবাদ: আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবুল মাহাসিন ইউসুফ ইবনে আবুল মায়ালী আহমদ ইবনে শাবীব ইবনে হুসাইন মিসরী বসরী মালেকী কায়রোতে ৬৬৯ হিজরীতে। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ ফকিহ্ মুকরী আদল আবু তালিব আব্দুর রহমান ইবনে আবুল ফাতাহ মোহাম্মদ ইবনে আবুল মুজাফ্ফর আব্দুস সামি ইবনে আব্দুল্লাহ্ কুরশী হাশেমি ওয়াসেত্বি সেখানে ৬২০ হিজরীতে। তিনি বলেন– আমি ওই সময় শিশু ছিলাম। আমার পিতা আবুল ফাতহের সাথে বসরায় শায়খুল কুদ্বওয়াত আবু মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ বসরী (রা.)'র নিকট আসলাম। তিনি তাঁর মুরিদদের সাথে কথা বলছিলেন। অতঃপর তিনি কথা বন্ধ করে দিলেন এবং কিছুক্ষণ নিশ্চুপ রইলেন। তাঁর সম্মানে উপস্থিত সকলেও চুপ হয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি মাথা জমিনের উপর রাখলেন (ثم وضع راسه على الارض) এবং বললেন 'আমার মাথার উপর'। অতঃপর তিনি যখন ঘরে প্রবেশ করলেন তখন আমার পিতাও তাঁর সাথে প্রবেশ করলেন। আর আমি তাঁদের উভয়ের পিছনে ছিলাম। অতঃপর আমার বাবা তাঁকে ইঙ্গিত করে বললেন– "ইয়া সায়্যেদি, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমাকে আজকের (মজলিসে সংঘটিত) এই কাজ এবং উক্তির কারণ একটু বলুন, যা আমরা আপনাকে করতে দেখেছি।" **অতঃপর তিনি বলেন– "নিশ্চয় শায়খ আব্দুল কাদের আজকে বাগদাদে বলেছেন– 'আমার এই ক্বদম (সম-সাময়িক) প্রত্যেক আল্লাহ্র অলির কাঁধের উপর'**। আর পৃথিবীতে এমন কোন অলি অবশিষ্ট নেই, যিনি এভাবে মাথা অবনত করেননি, যেভাবে তোমরা আমাকে করতে দেখেছ।"

বাহজাতুল আসরারে বর্ণিত উল্লেখিত ঘটনাটির সুস্পষ্ট বর্ণনায় দিনের আলোর মত পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে– আবু মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ বসরী (রা.) গাউসে

পাকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন মাটিতে মাথা রেখে। যেটাকে পারিভাষিক অর্থে 'তাযিমী সিজদা' বলা হয়। পরন্তু তাঁর বর্ণনা হতে এটাও স্পষ্ট হয় যে, তৎসময়ের আউলিয়ায়ে কেরাম ঠিক তাঁর মত করেই অর্থাৎ মাটিতে কপাল ঠেকিয়েই সম্মান প্রদর্শন করেছেন। আরও সহজভাবে বললে– সকল আউলিয়ায়ে কেরাম হুজুর গাউসে পাককে সিজদায়ে তাযিমী করেছেন এবং হুজুর গাউসে পাক সেই সিজদা গ্রহণ করেছেন। [দ্রঃ স্ক্যান নং-২৮]

এছাড়াও "বাহজাতুল আসরার" গ্রন্থের ২২০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে–

أخبرنا الشيخ الصالح أبو عبد الله محمد بن كامل بن أبي المعالي بن الحسيني البيساني، قال: سمعت الشيخ العارف أبا محمد مفرجة بن نبهان بن ركاف الشيباني، يقول : لما اشتهر أمر الشيخ محيي الدين عبد القادر ، اجتمع مائة فقيه من أعيان بغداد وأذكيائهم على أن يسأله كل واحد منهم مسألة في فن من العلوم غير مسألة صاحبه ليقطعوه بها، وأتوا مجلس وعظه، وكنت يوم إذن فيه، فلما استقر بهم المجلس أطرق الشيخ وظهرت من صدره بارقة من نور لا يراها إلا من شاء الله تعالى، ومرت على صدور المائة، ولم تمر على أحد منهم إلا وبهت ويضطرب، ثم صاحوا صيحة واحدة، ومزقوا ثيابهم، وكشفوا رؤوسهم، وصعدوا إليه فوق الكرسي، ووضعوا رؤوسهم على رجليه، وضج أهل المجلس ضجة واحدة ظننت أن بغداد رجت بها، فجعل الشيخ يضم إلى صدره واحدا منهم بعد واحد حتى أتى على آخرهم، ثم قال لأحدهم أما أنت فمسألتك كذا وجوابها كذا

অনুবাদঃ আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ ই সালিহ আবু আবদুল্লাহ্ মোহাম্মদ ইবনে কামিল ইবনে আবুল মা'আলী ইবনে মোহাম্মদ হুসাইনী বায়সানী। তিনি বলেন, আমি শায়খ-ই আরিফ আবু মোহাম্মদ মুফারাজ ইবনে নাবহান ইবনে রিকাফ শায়বানীকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, যখন শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদিরের প্রসিদ্ধি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো, তখন বাগদাদের একশ'জন প্রসিদ্ধ ফক্বীহ্ এবং বিজ্ঞ লোক এজন্য একত্রিত হলেন যে, তাঁদের প্রত্যেকে তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন করবেন এবং এ প্রশ্নের মাধ্যমে তাঁকে ঘায়েল করবেন। তাঁরা সবাই মিলে তাঁর ওয়া'যের মজলিসে আসলেন।

আমিও ওই দিন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। যখন তাদের নিয়ে মজলিস বসলো, তখন শায়খ মোরাকাবায় মগ্ন হলেন এবং তাঁর বক্ষ থেকে একটি নূর বিদ্যুতের মত আলোকিত হলো, যা ওই ব্যক্তিই দেখছিলেন যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা চাচ্ছিলেন। তা ওই একশ' ফক্বীহ্র বক্ষের উপর দিয়েও অতিক্রম করলো। যাঁর উপর দিয়েই সেটা অতিক্রম করলো তাঁর অবস্থা এ-ই হলো যে, তিনি বাকরুদ্ধ ও অস্থির হয়ে গেলেন। অতঃপর সবাই একযোগে চিৎকার করে উঠলেন এবং সবাই তাঁদের কাপড় ছিড়ে ফেললেন, মাথা থেকে টুপি-পাগড়ি যা ছিলো ফেলে দিলেন এবং তাঁর দিকে কুরসী পর্যন্ত দৌড়ে গেলেন **আর নিজ নিজ মাথা তাঁর দু পায়ের উপর রাখলেন (অর্থাৎ গাউসুল আযম শায়খ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী ক.-কে ঐ একশত ফক্বীহ্ তাযিমী সিজদা করলেন)**। এটা দেখে মজলিসে শোরগোল আরম্ভ হলো। আমার মনে হলো যে, ঐ আওয়াজে গোটা বাগদাদ প্রকম্পিত হয়ে ওঠেছে। অতঃপর শায়খ প্রত্যেককে আপন বুকের সাথে লাগালেন। এভাবে তাঁদের শেষ ব্যক্তিকেও এমনি বদান্যতা দেখালেন। অতঃপর একজনের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমার প্রশ্ন এটা, আর উত্তর হলো এ-ই। এভাবে প্রত্যেকের প্রশ্ন ও উত্তর বলে দিলেন। [দ্রঃ স্ক্যান নং-২৯]

'মাখযানে তাসাওউফ' গ্রন্থের বর্ণনাঃ শায়খ মাওলানা আব্দুর রহমান প্রকাশ আল্লামা হায়া বাদায়ুনী নিজামী চিশ্তি (রহ.) কর্তৃক রচিত তাসাওউফ পরিমণ্ডলের প্রসিদ্ধ একটি গ্রন্থ 'মাখযানে তাসাওউফ'-এর 'আদাবে শায়খ' অধ্যায়ে উল্লেখ আছেঃ

جب شیخ کے سامنے حاضر ہو تو اپنا سر زمین پر رکھے کیونکہ تمام خواجگان کا یہی دستور تھا اور ہر یک سلسلہ میں جاری ہے

অর্থঃ "যখন শায়খ (পীর)-এর সামনে উপস্থিত হবে তখন আপন মাথা জমিনে তথা মাটিতে রাখবে। কেননা সকল খাজাগণের রীতি এটাই ছিল এবং তা প্রত্যেক সিলসিলার মাঝে বহমান।" [দ্রঃ স্ক্যান নং-৩০]

'ফাওয়ায়েদুল ফাওয়াদ' গ্রন্থের বর্ণনাঃ হযরত খাজা নিজামুদ্দীন মাহবুবে ইলাহী বিভিন্ন মজলিসে তাঁর ভক্ত, মুরিদান এবং অনুরক্তদেরকে যে উপদেশগুলো দিয়েছেন সেগুলো সংকলন করে হযরত আমীর উলা সাঞ্জরী (র.) 'ফাওয়ায়েদুল

ফাওয়াদ' গ্রন্থটি রচনা করেন। যা তাসাওউফ পরিমণ্ডলে অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ একটি গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত। এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের ছেষট্টি তম মজলিসেও সিজদায়ে তাযিমী প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ আছে–

پھر اس بات کا ذکر نکلا کہ مخدوم کی خدمت میں مرید آتے ہیں اور سجدہ تعظیم کرتے ہیں۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ میرا جی تو چاہتا ہے کہ لوگوں کو منع کروں لیکن چونکہ میرے شیخ کے سامنے بھی اسی طرح ہوتا تھا۔ اس لئے منع نہیں کرتا۔ خادم نے اس پر عرض کیا کہ جو غلام مخدوم سے وابستہ ہیں اور جو مرید ہوے ہیں اور بیعت کی ہے ان کی یہ ارادت اور بیعت پیر کے عشق و محبت سے عبارت ہے۔ پس جہاں عشق و محبت کا دخل ہوتا ہے۔ وہاں زمیں پر سر رکھنا ایک معمولی سی خدمت ہے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے اس بات کی موافقت میں فرمایا کہ میں نے شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز سے سنا ہے کہ ایک دفعہ شیخ ابو سعید ابوالخیر رحمتہ اللہ علیہ کسی راستے میں سوار جارہے تھے کہ ایک مرید سامنے آیا اور یہ مرید پیدل تھا اس نے شیخ کے گھٹنے کو چوما۔ شیخ نے فرمایا کہ اور نیچے۔ مرید نے شیخ کے پیر کو چوما۔ شیخ نے فرمایا اور نیچے۔ مرید نے گھوڑے کے گھٹنے کو بوسہ دیا۔ شیخ نے فرمایا اور نیچے۔ مرید نے گھوڑے کے سم کو بوسہ دیا۔ شیخ نے کہا اور نیچے مرید نے زمیں چومی۔ اس وقت شیخ نے ارشاد کیا کہ یہ جو میں تجھ سے کہا جاتا تھا اور نیچے نیچے تو اس سے میرا مقصد زمین چومنا نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ تو جتنا جھکتا ہے اتنا ہی تیرا درجہ بلند ہوتا جاتا ہے

অর্থ: "পরবর্তী আলোচনা ছিলো মুরীদ মুর্শেদের দরবারে হাজির হয়ে **তাযিমী সিজদা** করা সম্বন্ধে। হযরত খাজা বললেন আমার পূর্বের জ্ঞান অনুসারে আমার খুবই ইচ্ছা ছিলো যে, আমি মানুষকে এরূপ তাযিম করতে নিষেধ করবো। কিন্তু যখন আমি দেখলাম আমার মুর্শেদের দরবারে এরূপ তাযিম হচ্ছে সবসময় কিন্তু তিনি কাউকে নিষেধ করছেন না, তখন হতে আমি আমার জ্ঞানকে শুধরে নিয়েছি এবং এখন আমি সে কাজ করতে কাউকে নিষেধ করছি না। আমি অধম আরজ করলাম যারা আপনার মুরীদ হয়েছে, আনুগত্য স্বীকার করেছে এবং

বায়াত গ্রহণের মাধ্যমে ঐশ্বর্যবান ও গর্বিত হয়েছে, তাঁদের জন্য পীরের প্রতি ইশ্‌ক ও মুহাব্বত হচ্ছে ইবাদত, তাঁরা যখন তাঁদের ইশ্‌ক ও মুহাব্বতের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ঐরূপ তাযিম করে তখন তা খারাপ কাজ হয় কী প্রকারে? আমার কথা শ্রবণ করে হযরত খাজা বললেন আমি আমার মুর্শেদ হযরত শায়খুল ইসলামের মুখে শুনেছি, একবার শায়খ আবু সাঈদ আবুল খায়ের রহমতুল্লাহি আলাইহি ঘোড়ার উপর আরোহণ করে কোথাও যাচ্ছিলেন। এ সময় তাঁর এক মুরীদ সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁর হাঁটুতে বুসা দিলেন শায়খ তখন তাঁকে বললেন, এর চেয়ে নিচে বুসা দাও। তিনি তখন তাঁর কদমে বুসা দিলেন। তিনি তখন তাঁকে বললেন আরো নিচে দাও। তিনি তখন জমিনে বুসা দিলেন। শায়খ তখন বললেন নিচে বুসা দেয়ার উদ্দেশ্য জমিনে বুসা দেওয়ার মধ্যে ছিলো না। আমি তোমার বুসা খাওয়ার সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছিলাম তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। তুমি যতই নিচে বুসা দিচ্ছিলে তোমার মর্যাদা ততই উচ্চ হতে আরও উচ্চতর হচ্ছিলো।" অতএব, এমন কাজ হতে কাউকে বিরত রাখা কারও উচিত নয়।   [দ্রঃ স্ক্যান নং-৩১]

তাযিমী সিজদা প্রসঙ্গে ইমাম শেরে বাংলা (র.)'র অভিমতঃ তাযিমী সিজদা প্রসঙ্গে ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা আযিযুল হক শেরে বাংলা (র.) তাঁর রচিত 'দিওয়ানে আযিয' গ্রন্থে খুবই ভারসাম্যপূর্ণ অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন– "এ যুগ যেহেতু 'ফিত্‌না'য় ভরে গেছে, সেহেতু 'সাধারণত' তা (তাযিমী সিজদা) হালাল বলে ফৎওয়া দেওয়া ভুল হবে।"

প্রথমেই লক্ষ্য করার ব্যাপার হলো– "এ যুগ যেহেতু ফিত্‌নায় ভরে গেছে" – এই অংশটুকু শর্তযুক্ত একটি বিষয়। এর ভাবার্থ হলো– যেহেতু এই যুগ ফিত্‌নায় ভরে গিয়েছে তাই তাযিমী সিজদাকে সাধারণভাবে হালাল ফৎওয়া দেওয়াটা ভুল হবে নতুবা সাধারণভাবে হালাল ফৎওয়া দেওয়া ভুল হতো না। অর্থাৎ সর্বসাধারণের জন্য তাযিমী সিজদা হালালের ফৎওয়া বৈধ ঘোষণা করার মূল অন্তরায় হল "ফিত্‌না"। মূলগতভাবে এটি হালাল, বরং নির্দিষ্ট পরিবেশ-প্রতিবেশের কারণেই এটির বৈধতা সর্বসাধারণের জন্য সাধারণভাবে উন্মুক্ত করে দেওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্যের অবতারণা ঘটেছে। দ্বিতীয়তঃ এখানে "সাধারণত" (উমুমান) একটি শব্দ রয়েছে। উসুলে ফিকহ্ সম্পর্কে ধারণাপ্রাপ্ত ব্যক্তি মাত্রই জ্ঞাত যে, 'আম'-এর ভিতর 'খাস' (Special) কিছু বিষয় থেকে

যায়। দুয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যায়, তাহলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে। পবিত্র কুরআনের অসংখ্য জায়গায় মহান আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন "তোমরা নামায কায়েম কর"। এই নির্দেশনাটি হল 'উমুমান'। কিন্তু অপ্রাপ্ত বয়স্ক, মস্তিষ্ক বিকৃত, ঋতুমতি মহিলা এই সাধারণ আদেশের অন্তর্ভুক্ত নয়। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন আল কুরআনে বার বার যাকাত এবং হজ আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু অপ্রাপ্ত বয়স্ক, গরিব, অসহায় ব্যক্তি এই সাধারণ নির্দেশের গণ্ডিভুক্ত নয়। এমন আরও শত উদাহরণ পেশ করা যায়। শুধুমাত্র "সাধারণত" (উমুমান) শব্দটির প্রাণধারা (Spirit) বুঝানোর জন্যই এতকিছু বলা। ইমাম শেরে বাংলা (র.) এই 'উমুমান' শব্দটি দিয়ে মূলত বুঝাতে চেয়েছেন তাযিমী সিজদার বৈধতার ফৎওয়া আমভাবে দেওয়াটা ভুল হবে। অর্থাৎ খাসভাবে (Specially) কারও কারও জন্য বৈধতা দেওয়া যাবে বা দেওয়া আছেই। এই যে বলা হলো, 'কারও কারও জন্য হালালের ফৎওয়া দেওয়া যাবে'– এটি কীসের ভিত্তিতে বলা হলো? অনেকের মনে এই প্রশ্নটি উঁকি দিতেও পারে। তাঁদের জ্ঞাতার্থেই উল্লেখ্য– এই কথাটিও ইমাম শেরে বাংলার রচিত 'দিওয়ানে আযিয' থেকে চয়িত। দিওয়ানে আযিয গ্রন্থে উল্লেখ আছে– "গশ্‌ত মাইজভাণ্ডার আয্ আঁ'জা সাজদাহ্ গা-হে আশেক্বাঁ" **অর্থ:** 'ওই স্থান থেকে মাইজভাণ্ডার আশেক্বদের সাজদাগাহে পরিণত হয়েছে।' অর্থাৎ আশেক্ব তথা প্রেমিকদের জন্য মাইজভাণ্ডার শরিফ সিজদাহ্‌র স্থান।

এমতাবস্থায় বিশেষ শ্রেণি (আশিক্ব-প্রেমিক)'র প্রতি লক্ষ্য না রেখে যদি তাযিমী সিজদাকে সবার জন্য ঢালাওভাবে "হারাম" ঘোষণা করা হয়, তখন ঐ বিশেষ শ্রেণির প্রতি এক ধরনের জুলুম করা হয়, এটি তাঁদের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ হয় না, বরং তাঁদেরকে দোষী সাব্যস্ত করে ফেলা হয়। আর এমনটা হলে কারা কারা দোষী হিসেবে সাব্যস্ত হয়ে যাবেন বা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাবেন তা তো উপরে উল্লেখিত রেফারেন্সগুলো বিবেচনায় নিলে সহজেই পরিষ্কার হয়ে যায়। তাই তো যাঁরা (যেসব সম্মানিত ইমাম) তাযিমী সিজদার ব্যাপারে বিপরীত মন্তব্য করেছেন তাঁরাও প্রায় সবাই এটিকে 'সাধারণত' বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ বিশেষদের জন্য যে বরাবরই জায়েয– সেদিকে ইঙ্গিত দিয়েই রেখেছেন।

তাযিমী সিজদা সম্পর্কে বেলায়তে মোত্‌লাকা কিতাবের ভাষ্য: তাযিমী সিজদা প্রসঙ্গে বেলায়তে মোত্‌লাকা কিতাবে বলা হয়েছে– "হযরত আদম (আ.)কে

ফেরেশ্‌তাগণ এবং হযরত ইউসুফ (আ.)কে তাঁহার পিতা-মাতা ও ভাইগণ যেই সজিদা করিয়াছিলেন, উহাকে সজিদায়ে তায়াজিমী বলা হয়।

যেমন আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেনঃ "যখন আমি ফেরেশ্‌তাগণকে বলিয়াছিলাম আদমকে সজিদা কর" (সূরা বাক্বারা-৩৪)।

কোরআন পাকে হযরত ইউসুফের বাণীঃ "আমি তাহাদিগকে, আমাকে সজিদা করিতে দেখিয়াছি" (সূরা ইউসুফ-১০০)।

উক্ত আয়াত মতে দেখা যায় সজিদা শুধুমাত্র বন্দেগী বা এবাদতে ব্যবহৃত হয় না; উহা তা'য়াজিম বা সম্মান প্রদর্শনার্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা হজরত আদম (আঃ) এর সম্মানার্থে তাঁহাকে ছজিদা করার জন্য ফেরেশ্‌তাগণকে নির্দেশ দিয়াছিলেন। হজরত ইউসুফ (আঃ)কে তাঁহার নবুয়ত ও সুলতানাতের মর্য্যাদা ও সম্মান প্রদর্শনার্থে তাঁহার বাপ ও ভাইগণ তাঁহাকে ছজিদা করিতে দেখা গিয়াছে। এইরূপ, এবাদতের নিয়ত ও নিয়ম কানুন ছাড়া যে ছজিদা সম্মানার্থে করা হয়, তাহাকে ছজিদায়ে তা'য়াজিমী বলে। উহা আল্লাহ্‌র এবাদত জনিত নহে বরং উচ্চ স্তরের ছালাম বা তায়াজিম।"

বেলায়তে মোত্‌লাকা কিতাবে এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ আছে– "ছজিদা যে শুধু মাটিতে কপাল রাখিলে হয় তাহা নহে বরং স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য ও আন্তরিক বিনয় প্রকাশ করাকেও ছজিদা বলা হয়। আল্লাহ্ পাকের পবিত্র কোরআন শরীফে উল্লেখ আছেঃ "তোমরা দেখিতেছ না আছমান বাসী ও জমিন বাসী, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র রাজি, পাহাড় পর্বত, উদ্ভিদ জগত, প্রাণীজগত ও বিরাট সংখ্যক মানবগণ আল্লাহ্ তায়ালাকে ছজিদা করে" (ছুরা হজ-১৮)।

অথচ ইহাদের প্রত্যেকের কপাল নাই। কপাল রাখিয়া ছজিদা করিতে সবাইকে দেখা যায় না। কাজেই বুঝা যায় যে, বিনয় ও আজিজীই ছজিদার প্রধান বস্তু।"

তাযিমী সিজদা প্রসঙ্গে উগ্রতা প্রদর্শন কখনোই কাম্য নয়ঃ পৃথিবীতে সুপ্রসিদ্ধ মাযহাব চারটি। মাযহাবের ইমামগণ এবং পরবর্তী উত্তরসুরীগণের মত-ভিন্নতার কারণেই মূলত ভিন্ন ভিন্ন মাযহাব গড়ে উঠেছে। উলামায়ে কেরাম খুব ভালভাবেই জ্ঞাত আছেন যে, ইমামগণের মতানৈক্যগুলো শুধুমাত্র শাখা-প্রশাখাগত কিংবা অমৌলিক বিষয়ে ছিল তা কিন্তু নয়। বরং অসংখ্য মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও তাঁদের মাঝে মতানৈক্য ছিল এবং এখনো আছে। তাঁদের মতানৈক্যের দূরত্ব ফরজ থেকে ওয়াজিব, ওয়াজিব থেকে সুন্নাত, জায়েয

থেকে নাজায়েয, ফরজ থেকে মকরূহে তাহরিমি, এমনকি হালাল থেকে হারাম পর্যন্ত সুপ্রসারিত। যেমন– ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মতে ওযুর ফরজ ৪টি। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে ওযুর ফরজ ৬টি। অর্থাৎ শাফেয়ীদের ফৎওয়া অনুসারে হানাফিরা দুটো ফরজ তরককারী। কিন্তু এর জন্য শাফেয়ীরা হানাফিদেরকে ফরজ তরককারী বলে ফৎওয়া প্রদান করেন না কিংবা ফরজ তরক করার জন্য তাঁদেরকে বাতিল, কাফির, ভণ্ড বলে প্রতিটি ওয়াজে ওয়াজে প্রোপাগান্ডাও চালান না। এরকম ফরজ, ওয়াজিব, হালাল, হারামকে কেন্দ্র করে মাযহাবের ইমামগণের মাঝে আরও অসংখ্য মতানৈক্যপূর্ণ বিষয় রয়েছে। যেমন–

১. হানাফী মাযহাব অনুযায়ী নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী ফরজ।

২. ইমাম আবু হানিফার মতে বিতির নামায পড়া ওয়াজিব (ইমাম ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের মতে সুন্নত)। মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী সুন্নত।

৩. হানাফী মাযহাব অনুযায়ী হজের সময় ব্যতীত দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়া নাজায়েয। মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী সফরের সময়, বৃষ্টিপাত হলে, অসুস্থতার কারণে ও শরিয়ত সম্মত কারণে যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়া জায়েয।

৪. হানাফী মাযহাব অনুযায়ী ইমামের পিছনে মুক্তাদির সূরা ফাতিহা পড়া মাকরূহে তাহরিমী। শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী ফরজ।

৫. মালেকী ও হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী ইমাম যখন জোরে তথা শব্দ করে কিরাত পড়েন তখন মুক্তাদির কিরাত পড়া মাকরূহে তাহরিমী এবং ইমাম যখন আস্তে তথা নীরবে কিরাত পড়েন তখন মুক্তাদির কিরাত পড়া মুস্তাহাব। কিন্তু হানাফী মাযহাব অনুযায়ী ইমামের পিছনে মুক্তাদিকে কোন কিরাত পড়তে হয় না।

৬. ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ, আহমদ বিন হাম্বল (র.) তথা অধিকাংশ ইমামদের মতে কুমির খাওয়া হারাম কিন্তু ইমাম মালেক (র.)-এর মতে জায়েয।

পরন্তু একই মাযহাবের ইমামদের মধ্যেও মতানৈক্যের দৃষ্টান্ত অসংখ্য। যেমন– নামাযে যে কোন ভাষায় কুরআন তেলাওয়াত করা ইমাম আবু হানিফার মতে জায়েয ছিল। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদের মতে নাজায়েয। অর্থাৎ কোন মাযহাবের মতে যে কাজ করা ফরজ ঠিক একই কাজ করা অপর

মাযহাবের মতে মাকরূহে তাহরিমি হলেও কিংবা অধিকাংশ মাযহাবের মতে যে প্রাণী খাওয়া হারাম, সুনির্দিষ্ট কোন মাযহাবের মতে সে প্রাণী খাওয়া হালাল হলেও উলামায়ে কেরাম উক্ত মাযহাবের প্রবক্তা কিংবা অনুসারীকে হারাম কাজের কর্তা হিসেবে সাব্যস্ত করেননি এবং আমরাও করি না। বরং সকলকেই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে বিশ্বাস রাখি। উলামায়ে কেরামের এরূপ আচরণ থেকে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, ইসলামে ঈমানের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে মতানৈক্যের অবকাশ রয়েছেই। যার বাস্তব দৃষ্টান্ত হলো মাযহাব চতুষ্টয়।

এ কথা সর্বজনবিদিত যে "সিজদায়ে তাযিমী"র মাসয়ালাটি মূলত ফুরূয়ী তথা শাখাগত একটি বিষয়। এটির 'এবাহত' তথা বৈধতা প্রসঙ্গে যাঁরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাঁরা কেউই এটিকে ফরজ, ওয়াজিব এমনকি সুন্নত বলেও দাবি করেননি। সুতরাং যাঁদের মতে সিজদায়ে তা'যিমী নিষিদ্ধ বস্তু তাঁরা এর থেকে বিরত থাকবেন, আর যাঁদের মতে এর বৈধতা বিদ্যমান রয়েছে তাঁরা তাঁদের মতানুসারে চলবেন। পূর্বোক্ত উলামায়ে কেরামের নৈতিক অবস্থানের আলোকে বর্তমান উলামায়ে কেরামের নৈতিক অবস্থান এবং বক্তব্য এটাই হওয়া উচিত।

মনের মাঝে উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক যে, তাযিমী সিজদার বৈধতা প্রসঙ্গে ফিক্হী কোন কিতাবের রেফারেন্স সংযুক্ত করা হয়নি কেন? মূলত তাজিমী সিজদা প্রসঙ্গটি সুফিয়ায়ে কেরামের আচরিত একটি বিষয়। সুতরাং সুফিদের জীবনদর্শন ভিত্তিক কিতাবাদির রেফারেন্সই এক্ষেত্রে অধিক প্রাসঙ্গিক। পরন্তু বেলায়তে মোত্লাকা যেহেতু একটি সুফি ঘরানার কিতাব তাই বিশ্ব তাসাওউফ পরিমণ্ডলের অপরাপর বিখ্যাত গ্রন্থগুলোতে এ প্রসঙ্গে যে বিষয়গুলো বর্ণিত হয়েছে তা এখানে সন্নিবেশ করা অধিকতর প্রাসঙ্গিক। তাই তাযিমী সিজদা প্রসঙ্গে শুধুমাত্র বিভিন্ন তাসাওউফ গ্রন্থের রেফারেন্সই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

পুস্তকে উল্লেখিত রেফারেন্সসমূহের মূল কিতাবের স্ক্যান কপি

میں سے نظر آتی ہے۔ اور اس کے اکثر علوم جو آرائے اہل حق کے مخالف ہیں خطا اور ناصواب ظاہر ہوتے ہیں۔ شاید خطائے کشفی کے باعث اس کو معذور رکھا ہے۔ اور خطائے اجتہادی کی طرح ملامت کو اس سے ہٹا رکھا ہے ✦

شیخ محی الدین کے حق میں فقیر کا اعتقاد خاص بھی یہی ہے کہ اس کو مقبولوں میں سے جانتا ہے اور اس کے مخالف علوم کو خطا اور مضر دیکھتا ہے ✦

اس طائفہ میں سے بعض لوگ شیخ کو طعن و ملامت بھی کرتے ہیں اور اس کے علوم کو بھی خطا پر جانتے ہیں۔ اور بعض لوگ شیخ کی تقلید اختیار کر کے اس کے تمام علوم کو بہتر اور صواب جانتے ہیں۔ اور ان علوم کی حقیقت کو دلائل و شواہد کے ساتھ ثابت کرتے ہیں۔ اور شک نہیں کہ ان دونوں فریقوں نے افراط و تفریط کا رستہ اختیار کیا ہے۔ اور توسط حال سے دور رہے ہیں۔ شیخ کو جو مقبول دنیا میں سے ہے خطائے کشفی کے باعث کس طرح رد کیا جائے۔ اور اس کے علوم کو جو صواب سے دور اور اہل حق کی آراء کے مخالف ہیں تقلید سے کس طرح قبول کئے جائیں۔ فَالْحَقُّ هُوَ التَّوَسُّطُ الَّذِیْ وَفَّقَنِیَ اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ بِمَنِّهٖ وَكَرَمِهٖ۔ پس حق یہی توسط ہے جس کی توفیق اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے بخشی ہے ✦

تمام مسئلہ وحدت وجود میں اسی گروہ میں سے ایک جم غفیر یعنی بہت سے لوگ شیخ کے ساتھ شریک ہیں۔ اگرچہ شیخ اس مسئلہ میں بھی طرز خاص رکھتا ہے۔ لیکن اصل بات میں سب کے سب باہم شریک ہیں۔ یہ مسئلہ بھی اگرچہ بظاہر اہل حق کے مخالف ہے لیکن توجیہ کے قابل اور جمع کے لائق ہے ✦

اس فقیر نے اللہ تعالیٰ کی عنایت سے حضرت ایشاں قدس سرہ کی رباعیات کی شرح میں اس مسئلہ کو اہل حق کے معتقدات کے ساتھ جمع کیا ہے۔ اور فریقین کی نزاع کو لفظی کی طرف راجع کیا ہے۔ اور دونوں طرف کے شکوک اور شبہات کو اس طرح حل کیا ہے کہ کسی میں کوئی شک و شبہ کا محل نہیں۔ كَمَا لَا يَخْفٰى عَلَى النَّاظِرِ فِيْهِ۔ جیسے کہ اس کے دیکھنے والے پر پوشیدہ نہیں ہے ✦

جاننا چاہئے کہ ممکنات کیا جواہر کیا اعراض اور کیا اجسام اور کیا عقول اور کیا نفوس اور کیا افلاک اور کیا عناصر سب کے سب اس قادر مختار کی ایجاد کی طرف منسوب ہیں جو ان کو عدم کی پوشیدگی سے وجود میں لایا ہے۔ اور جس طرح یہ سب چیزیں اپنے وجود میں حق تعالیٰ کی محتاج

دوسرا قصیدہ

نَظَرْتُ بِعَيْنِ الْفِكْرِ فِي حَانِ حَضْرَتِي ۱ حَبِيْبًا تَجَلّٰى لِلْقُلُوْبِ فَحَنَّتِ

میں نے دوست کو اپنے قربِ خاص کے وقت بچشمِ تفکر دیکھا وہ دلوں پر جلوہ گر ہوا تو دل اس کے مشتاق ہو گئے

سَقَانِيْ بِكَأْسٍ مِنْ مُدَامَةِ حُبِّهٖ ۲ فَكَانَ مِنَ السَّاقِيْ خُمَارِيْ وَسُكْرَتِيْ

مجھے دوست نے اپنی شرابِ محبت کا جام پلایا پس میری مستی اور مدہوشی ساقی ہی کی طرف سے ہے

يُنَادِمُنِيْ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ۳ وَمَا زَالَ يَرْعَانِيْ بِعَيْنِ الْمَوَدَّةِ

وہ ہر دن اور رات میں میرا ساتھی ہے اور ہمیشہ محبت کی نگاہ سے میری رعایت فرماتا ہے

ضَرِيْحِيْ بَيْتُ اللّٰهِ مَنْ جَاءَ زَارَهٗ ۴ يُهَرْوِلُ لَهٗ يَحْظٰى بِعِزٍّ وَرِفْعَةٍ

میری قبرِ شریف اللہ کا گھر ہے جو اس کی زیارت کو آئیگا اور سعی کرے گا عزت و بلندی سے بہرہ ور ہوگا

وَسِرِّيْ سِرُّ اللّٰهِ سَارٍ بِخَلْقِهٖ ۵ فَلُذْ بِجَنَابِيْ اِنْ اَرَدْتَ مَوَدَّتِيْ

میرا باطن اللہ کا بھید ہے اس کی مخلوق میں سرایت کیے ہوئے ہے تو میری بارگاہ میں پناہ لے اگر میری دوستی چاہتا ہے

وَاَمْرِيْ اَمْرُ اللّٰهِ اِنْ قُلْتُ كُنْ يَكُنْ ۶ وَكُلٌّ بِاَمْرِ اللّٰهِ فَاحْكُمْ بِقُدْرَتِيْ

اور میرا حکم اللہ کا حکم ہے اگر میں کہوں ہوجا تو ہوجاتا ہے اور میری یہ سب قدرت اللہ کے حکم سے ہے

وَاَصْبَحْتُ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ جَالِسًا ۷ عَلٰى طُوْرِ سِيْنَا قَدْ سَمَوْتُ بِخِلْعَتِيْ

اور میں نے صبح کی وادیِ مقدس میں بیٹھے طورِ سینا پر اور میں اپنی پوشاک (مقام و مرتبہ) کے ساتھ اونچا ہوگیا

وَطَابَتْ لِيَ الْاَكْوَانُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۸ فَصِرْتُ لَهَا اَهْلًا بِتَصْحِيْحِ نِيَّتِيْ

اور خوشگوار ہوگئے میرے لیے موجودات ہر پہلو سے پس میں اپنی صحتِ نیت کے سبب اس کے لیے اہل ہوگیا

فَلِيْ عَلَمٌ عَلٰى ذِرْوَةِ الْمَجْدِ قَائِمٌ ۹ رَفِيْعُ الْبِنَا تَاْوِيْ لَهٗ كُلُّ اُمَّةٍ

نے وہ چیز مانگی اور اُسے شناخت کیا جو انتہا رکھتی ہے۔ اور آپ نے اس چیز کو شناخت کیا جو انتہا نہیں رکھتی اور ایسی چیز کے ادراک کی طلب میں ادب کو ملحوظ رکھا جو ادراک نہیں کی جا سکتی۔ اور اسی کے حصول کی بابت دعا کو ترک رکھا۔ اس لئے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لئے یہ بات نہیں رکھی۔ اس لئے کہ یہ اس کی ذاتی خصوصیت ہے جس کو خدا نے اپنی تمام مخلوق سے اپنے لئے مختار فرمایا ہے پس دیکھو کہ کتنا فرق ہے۔ اس شخص کے مرتبہ میں جس کی معرفت محدود ہے اس شخص کے مرتبہ سے جس کی معرفت غیر محدود ہے۔ اس مقام میں محمدی اولیاء نے کہہ دیا جو کہہ دیا۔

نبوت اور ولایت شیخ عبدالقادر کا قول فتوحات مکیہ میں محی الدین ابن عربیؒ نے باسناد خود بیان کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اے انبیاء کے گروہ تم کو تو نبوت کا لقب ملا اور ہم نے وہ چیز پائی جو تم کو نہیں ملی۔ اور شیخ ابوالغیث بن جمیلؒ نے کہا ہے کہ ہم نے ایسے دریا میں غوطہ لگایا کہ نبی جس کے صرف کنارے پر ٹھہرے ہیں۔ یہ کلام اگرچہ ایک وجہ تاویل کی رکھتا ہے۔ لیکن ہمارا مذہب یہ ہے کہ مطلق نبی مطلق ولی سے افضل ہے۔ نبوت اور ولایت کے متعلق انشاء اللہ اسی کتاب میں ذکر آئیگا۔ مترجم عرض کرتا ہے کہ جس شخص کو صوفیائے کرام کی کلام سے حیرت پیدا ہو وہ شاہ ولی اللہ صاحب دہلویؒ کی کتب تصوف کا مطالعہ کرے صوفیائے کرام کے یہ تمام حقائق نفس کلیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور نبوت کا مقام اس سے بالاتر ہے۔

اڑتیسواں باب ۳۸

انجیل کے رموز و اشارات

اللہ تعالیٰ نے سریانی زبان میں عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی۔ اور سترہ زبانوں میں اس کی قرأت کی گئی انجیل کی ابتداء اسم اب وام وابن سے ہے۔ جیسا قرآن کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ ان کی قوم نے اس کلام کو ظاہر پر محمول کیا۔ اور گمان کیا کہ اب۔ ام۔ ابن۔ روح۔ مریم۔ عیسیٰ سے مراد ہیں۔ اور کہہ دیا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے۔ یہ نہ جانا کہ اب سے مراد اسم اللہ ہے۔ اور ام سے کنہ ذات جو ماہیت حقائق سے معتبر ہے۔ اور ابن سے کتاب مراد ہے۔ اور وہ وجود مطلق

منی دانه در آسمان مثل یابند و نه در زمین صفتی دانند صفات من در غیب غایب است و آن که در سراپرده غیب است از او سخن گفتن جهل محض است و سراسر همه غیب است پس چون کسی چنین بود چگونه این کس این کس بود بلکه این کس را زبان حق بود و گوینده نیز حق* و گفت آنکه نطق او بی نطق بود و بی سمع و بی بصر تالاجرم حق بر زبان بایزید سخن گوید و آن آن بود که لوائی اعظم من لواء محمد بلی لوای حق از لوای محمد عظیم تر بود چون روا داری که انی انا الله از درختی پدید آید روا دار که لوائی اعظم من لواء محمد و سبحانی ما اعظم شانی از درخت نهاد بایزید آید **الله اعلم و احکم**

مناجات شیخ بایزید قدس الله روحه العزیز

بایزید را مناجاتی است، بارخدایا تاکی میان من و تو منی و توئی بود منی ازمیان بردار تامنیت من بتو باشد تا من هیچ نباشم و گفت الهی تا با توام بیشتر از همه ام و تا با خودم کمتر از همه ام و گفت الهی مرا فقر و فاقه بتو رسانید و لطف تو آنرا زایل نگردانید و گفت خدایا مرا زاهدی نمی باید و قرائی نمی باید و عالمی نمی باید اگر مرا از اهل چیزی خواهی گردانید از اهل شمهٔ از اسرار خود گردان و بدرجهٔ دوستان خود برسان الهی ناز بتو کنم و از تو بتو رسم الهی چه نیکوست واقعات الهام تو بر خطرات دلها و چه شیرین است روش افهام تو در راه غیبها و چه عظیم است حالتی که خلق کشف نتوانند کرد و زبان وصف آن نداند و این قصه بسر نیاید و گفت الهی عجب نیست از آنکه من ترا دوست دارم و من بنده عاجز و ضعیف محتاج عجب آنکه تو مرا دوست داری و تو خداوندی و پادشاه و مستغنی و گفت الهی که میترسم اکنون و بتو چنین شادم چگونه شادمان نباشم اگر ایمن گردم* نقلست که بایزید هفتاد بار بحضرت عزت قرب یافت هر بار که باز آمدی زناری بربستی و باز بریدی عمرش چون بآخر آمد در محراب شد و زناری بربست و پوستینی داشت باژگونه در پوشید و کلاه باژگونه برسر نهاد و گفت الهی ریاضت همه عمر نمی فروشم و نماز همه شب عرضه نمی کنم و روزهٔ همه عمر نمی گویم و ختمهاء قرآن نمی شمرم و اوقات مناجات و قربت باز نمی گویم و تو می دانی که بهیچ باز نمی نگرم و این که بزبان شرح می

برای عبادتی بافکری در خانه شدی و سوراخها محکم کردی گفتی ترسم که آوازی یا بانگی مرا بشوراند و آن خود بهانه بودی * و **عیسی بسطامی** گوید سیزده سال با شیخ صحبت داشتم که از شیخ سخنی نشنیدم عادتش چنان بودی سر بر زانو نهادی چون سر بر آوردی آهی بکردی و دیگر باره بر آن حالت بازشدی * نقلست که **شیخ سهلگی** گوید این در حالت قبض بوده است والا در روزگار بسط از شیخ هر کسی فواید بسیار گرفته‌اند * و یکبار در خلوت بود بر زبانش برفت که **سبحانی ما اعظم شانی** چون باخود آمد مریدان بااو گفتند که چنین کلمهٔ بر زبان تو برفت شیخ گفت خداتان خصم **بایزید** تان خصم اگر ازین جنس کلمهٔ بگویم مرا پاره پاره بکنید پس هر یکی را کاردی بداد که اگر نیز چنین سخنی آیدم بدین کاردها مرا بکشید مگر چنان افتاد که دیگر بار همان گفت مریدان قصد کردند تا بکشندش خانه از **بایزید** انباشته بود اصحاب خشت از دیوار بیرون گرفتند و هر یك کاردی می زدند چنان کارگر می آمد که کسی کارد بر آب زند هیچ زخم کارد پیدا نمی آمد، چون ساعتی چند بر آمد آن صورت خورد می شد **بایزید** پدید آمد چون صعوهٔ خرد در محراب نشسته، اصحاب در آمدند و حال بگفتند شیخ گفت **بایزید** اینست که می بینید آن **بایزید** نبود پس گفت **نزّه الجبار نفسه علی لسان عبده** اگر کسی گوید این چگونه بود گویم چنانکه **آدم** علیه السلام در ابتدا چنان بود که سر در فلك می سود جبرئیل علیه السلام پری بفرق او فرود آورد تا **آدم** بمقدار کوچکتر باز آمد چون روا بود صورتی مهتر که کهتر گردد برعکس این هم روا بود چنانکه طفلی در شکم مادر دو من بود چون بجوانی می رسد دویست من می شود و چنانکه جبرائیل علیه السلام در صورت بشری بر مریم متجلی شد، حالت شیخ هم ازین شیوه بوده باشد، اما تا کسی بواقعهٔ آنجا نرسد شرح سود ندارد * نقلست که وقتی سیبی سرخ بر گرفت در نگریست گفت این سیبی لطیفست بسرش ندا آمد که ای **بایزید** شرم نداری که نام ما بر میوه نهی و چهل روز نام خدای بر دلش فراموش شد شیخ گفت سوگند خوردم تا زنده باشم میوه **بسطام** نخورم * و گفت روزی نشسته بودم بر خاطرم بگذشت که من امروز پیر وقتم و بزرگ عصرم چون این اندیشه کردم دانستم غلطی

لحظات بود که بتوحید نگریستم سالها در آن وادی بقدم افهام دویدم تامرغی گشتم چشم
ازیکانگی پر او از همیشگی درهوای چگونگی می پریدم چون از مخلوقات غایب گشتم
گفتم بخالق رسیدم پس سراز وادی بوبیت بر آوردم کاسهٔ بیاشامیدم که هرگز تا ابد
از تشنگی اوسیراب نشدم پس سی هزار سال در فضای وحدانیت او پریدم وسی هزار سال
دیگر در الوهیت پریدم وسی هزار سال دیگر درفردانیت چون نود هزار سال بسر آمد بایزید
را دیدم و من هرچه دیدم همه من بودم پس چهار هزار بادیه بریدم و به نهایت رسیدم چون
نگه کردم خودرا دیدم دربدایت درجه انبیا پس چندانی در آن بی نهایتی برفتم که گفتم
بالای این هرگز کسی نرسیده است و برتر از این مقام ممکن نیست چون نیك نکه کردم
سر خود بر کف پای یکی نبی دیدم پس معلوم شد که نهایت حال اولیاء بدایت احوال انبیاست
نهایت انبیار اغایت نیست پس روح من برهمه ملکوت بکذشت بهشت ودوزخ بدو
نمودند و بهیچ التفات نکرد وهرچه در پیش او آمد طاقت آن نداشت و بجان هیچ پیغمبر
نرسید الا که سلام کرد چون بجان مصطفی علیه السلام رسید آنجا صد هزار دریاء آتشین
دید بینهایت و هزار حجاب از نور که اگر باول دریا قدم نهاد می بسوختمی وخودرا
بباد برداد می تالاجرم ازهیبت و دهشت چنان مدهوش گشتم که هیچ نماندم هرچند خواستم
تامیخ طناب خیمه محمد رسول الله بتوانم دید زهره نداشتم با آنکه بحق رسیدم زهره نداشتم
بمحمد رسیدن یعنی هرکس برقدر خویش بخدای تواند رسید که حق باهمه است اما
محمد در پیشان درحرم خاص است لاجرم تاوادی لااله الاالله قطع نکنی بوادی محمد
رسول الله توانی رسیدن ودرحقیقت هردوی وادی یکی است چنان که آن معنی که گفتم
که مرید بوتراب حق رامی دید وطاقت دیدار بایزید نداشت پس بایزید گفت الهی هر
چه دیدم همه من بودم بامنی مرابتوراه نیست واز خودی خودمرا گذر نیست مرا چه باید
کرد فرمان آمد که خلاص تو از تو ئی تو در متابعت دوست ماست محمد عربی دیده را ایخاك قدم
او اکتحال کن و برمتابعت او مداومت نمای تعجب از قومی دارم که کسی را چندین تعظیم نبوت
بود آن گاه سخن گوید بخلاف این و معنی این ندانند چنان که بایزید را گفتند فردای
قیامت خلایق در تحت لوای محمد علیه الصلوة والسلام باشند گفت بخدائی خدای که لوای
من از لوای محمد زیادت است که پیغامبران و خلایق در تحت لوای من باشند یعنی چون

بعد ازتوحید# وگفت حق را بخواب‌دیدم مراگفت یا بایزید چه میخواهی گفتم آن میخواهم که تو میخواهی فرمود که‌من ترا ام چنانکه تومرائی# وگفت حق‌رابخواب دیدم‌پرسیدم که‌راه‌بتوچونست گفت‌ترك خودگوی که‌بمن‌رسیدی# وگفت‌خلق‌پندارند که‌من چون ایشان یکی‌ام اگر صفت من‌درعالم غیب بینند همه‌هلاك شوند# وگفت مثل من‌چون‌مثل دریاست که‌آنرا نه‌عمق پدیداست و نه اول و آخر پید است ویکی از وی سئوال کرد که‌عرش‌چیست گفت‌منم وگفت کرسی‌چیست گفت‌منم# وگفت لوح قلم‌چیست گفت‌منم گفتندخدایرابند گانندبدل ابراهیم و موسی وعیسی صلوات الله‌علیهم اجمعین گفت آن‌همه‌منم گفتند میگویند که‌خدای‌رابند گان‌اند بدل جبرائیل و میکائیل و اسرافیل گفت‌آن همه‌منم مرد خاموش شد بایزید گفت بلی‌هرکه در حق محو شدو بحقیقت‌هر چه‌هست رسیدهمه حق است‌اگر آنکس نبود حق همه را بیند عجب نبود والله‌اعلم واحکم .

معراج شیخ بایزید قدس‌الله روحه العزیز

این را بیاریم و ختم کنیم شیخ گفت‌بچشم‌یقین‌در حق نگرستم‌بعد از آنکه‌مرا از همه‌موجودات بدرجهٔ استغنارسانید وبنور خودمنور گردانید و عجایب اسرار بر من آشکاراکرد وعظمت هویت‌خویش بـرمن‌پیدا آورد من از حق برخود نگرستم و در اسراروصفات خویش تأمل‌کردم نورمن در جنب نورحق ظلمت بود عظمت‌من در جنب‌عظمت حق عین حقارت گشت عزت من درجنب‌عزت حق عین پندارشد آنجا همه صفات‌بود و این‌جا همه کدورت باز چون‌نگاه‌کردم بود خود بنور او دیدم‌عزت خود از عظمت وعزت او دانستم هرچه کردم بقدرت او توانستم کرد دیدهٔ قالبم هرچه یافت اوز یـافت بچشم انصـاف و حقیقت نظر کردم همه پرستش‌خود از حق بودنه از من و من پنداشته بودم که منش می‌پرستم گفتم بار خدایا این چیست گفت آن‌همه منم و نه‌غیر من یعنی مباشر افعال توئی لیکن مقدر ومیسر تو منم تا توفیق من‌روی ننمایدازوطاعت‌توچیزی نیاید پس دیده من از واسطه دیدن او از من‌دیده بردوخت ونگرش بـاصل کار وهویت خویش‌در آموخت ومرا از بود خود نـاچیز کرد وبیقاء

الہام خداوندی مجھے پیر کی حرکات وسکنات وافعال واطوار میں سے کسی بات پر اعتراض کو دخل نہ دے کیونکہ اسپر ادنیٰ اعتراض بھی لانے سے محرومی اور بے نصیبی آجاتی ہے کہ۔

مصرع　　بے ادب محروم گشت از فضل رب

اگر کسی بات میں شبہ پیدا ہو فوراً پیر سے دریافت کرلے اگر حل نہو تقصیر اپنے پر دہرے کہ اس طائفہ علیہ کا عیب میں بدترین خلائق کہلاتا ہے مرید کو چاہئے کہ اپنے چہرۂ دلکو جمیع جہات سے موڑ کر اپنے پیر ہی کی حضور میں متوجہ اور منتظر فیضان ہو رہے حتی کے بغیر ان کے حکم کی نوافل واذکار میں مشغول نہووے کہ۔

بیت

یک زمانہ صحبتے با اولیا　÷　خوشتر از صد سالہ طاعت بے ریا

حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی" تحریر فرماتے ہیں کہ اصحاب رضوان اللہ تعالےٰ علیہم اجمعین باہم کہا کرتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعة[1] حضرت خواجہ احرارؒ فرماتے ہیں۔

فرد

نماز را بحقیقت قضا بود لیکن　÷　نماز صحبت مارا قضا نخواہد بود

بیت

نار خنداں باغ را خنداں کند　÷　صحبت مردانت از مردان کند

کوئی بزرگ کسی سالک سے کہا کہ حضرت بایزیدؒ سے صحبت رکھا کیجیو اس نے جواب دیا کہ میں صحبت خدا سے رکھتا ہوں وہ مرد بزرگ بولا کہ بایزید کی صحبت خدا کی صحبت سے بہتر ہے یعنی تو بقدر نسبت اپنے حوصلے کے اندازہ فیض وبرکت جناب حضرت الٰہی سے

[1] بیٹھ ہمارے ساتھ ایمان لاویں ہم ایک ساعت ۱۲

اور مجھ سے پہلے جو تم میں دعویٔ عشق کرتا تھا اگرچہ طاقتور تھا میرے دبدبے کے سبب ملال مشغول کرتا ہے

شَرِبْتُ بِكَاسَاتِ الْغَرَامِ مُلَافَةً ۱۰ بِهَا انْعَشْتُ قَلْبِيْ وَجِسْمِيْ وَمُهْجَتِيْ

میں نے بہترین شراب معرفت محبت کے پیالوں سے پی ہے اور اسی کے ساتھ میں نے اپنے دل اور جسم و جان کو بلند کیا ہے

وَقَفْتُ بِبَابِ اللّٰهِ وَحْدِيْ مُوَحِّدًا ۱۱ وَنُوْدِيْتُ يَا جِيْلَانِيْ اُدْخُلْ لِحَضْرَتِيْ

میں تنہا اللہ تعالیٰ کو ایک جانتے مجھے اللہ تعالیٰ کے دروازے پر کھڑا ہو گیا اور مجھے پکارا گیا اے جیلانی میری حضوری کیلئے داخل ہو

وَنُوْدِيْتُ يَا جِيْلَانِيْ اُدْخُلْ وَلَا تَخَفْ ۱۲ عُطِيْتُ اللِّوٰى مِنْ قَبْلِ اَهْلِ الْعِنَايَةِ

اور مجھے پکارا گیا اے جیلانی داخل ہو اور مت ڈر و میں اہلِ عنایت سے پہلے جھنڈا دیا گیا ہوں

ذِرَاعِيْ مِنْ فَوْقِ السَّمٰوٰتِ كُلِّهَا ۱۳ وَمِنْ تَحْتِ بَطْنِ الْحُوْتِ اَمْدَدْتُ رَاحَتِيْ

میری کلائی سب آسمانوں کے اُوپر ہے اور میں نے اپنا ہاتھ (زمین کے نیچے کی) مچھلی کے پیٹ کے نیچے دراز کر رکھا ہے

وَاَعْلَمُ نَبَاتَ الْاَرْضِ كَمْ هُوَ نَابِتٌ ۱۴ وَاَعْلَمُ رَمْلَ الْاَرْضِ كَمْ هُوَ رَمْلَةٍ

اور میں زمین کے اگاؤ کو جانتا ہوں کہ وہ کتنا اگا ہوا ہے اور میں زمین کی ریت کو جانتا ہوں کہ وہ کتنے ذرے ہیں

وَاَعْلَمُ عِلْمَ اللّٰهِ اُحْصِيْ حُرُوْفَهٗ ۱۵ وَاَعْلَمُ مَوْجَ الْبَحْرِ كَمْ هُوَ مَوْجَةٍ

اور میں اللہ تعالیٰ کے علم کو جانتا ہوں مجھے اس کے حروف کا شمار ہے اور میں سمندر کی موجوں کو جانتا ہوں کہ وہ کتنی ہیں

وَلِيْ نَشْاَةٌ فِي الْحُبِّ مِنْ قَبْلِ آدَمٍ ۱۶ وَسِرِّيْ سَرٰى فِي الْكَوْنِ مِنْ قَبْلِ نَشْاَتِيْ

اور میری کونپل محبت میں آدم سے پہلے ہے اور میرا بھید جہان میں میری پیدائش سے پہلے پوشیدہ ہے

وَسِرِّيْ فِي الْعُلْيَا بِنُوْرِ مُحَمَّدٍ ۱۷ فَكُنَّا بِسِرِّ اللّٰهِ قَبْلَ النُّبُوَّةِ

اور میرا بھید بلندی میں محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے نور کے ساتھ تھا۔ پس ہم اللہ کے بھید میں نبوت سے پہلے تھے ،

مَلَكْتُ بِلَادَ اللّٰهِ شَرْقًا وَمَغْرِبًا ۱۸ وَاِنْ شِئْتُ اَفْنَيْتُ الْاَنَامَ بِلَحْظَتِيْ

میں اللہ کے شہروں کے مشرق و مغرب کا مالک ہو گیا اور اگر میں چاہوں تو لوگوں کو اپنی آنکھ جھپکنے میں فنا کر دوں

میں اپنے مرید کا محافظ ہوں جس چیز سے کہ وہ ڈرے اور میں معاملات کی برائی اور سختی سے لیے نجات لاتا ہوں

وَكُنْ يَا مُرِيدِي حَافِظًا لِعُهُودِنَا ۲۹ أَكُنْ حَاضِرَ الْمِيزَانِ يَوْمَ الْوَقِيعَةِ

اور اے میرے مرید تو ہمارے وعدوں کا محافظ ہو جائیں بروز قیامت میزان پر حاضر ہوں گا

أَنَا كُنْتُ فِي الْعَلْيَا بِنُورِ مُحَمَّدٍ ۳۰ وَفِي قَابَ قَوْسَيْنِ اجْتِمَاعُ الْأَحِبَّةِ

میں بلندیوں میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور قاب قوسین میں پیاروں کا ملاپ تھا

أَنَا كُنْتُ مَعَ نُوحٍ أُشَاهِدُ فِي الْوَرَى ۳۱ بِحَارًا وَطُوفَانًا عَلَى كَفِّ قُدْرَتِي

میں نوح علیہ السلام کے ساتھ تھا مشاہدہ کرتا تھا مخلوق میں دریاؤں اور طوفان کا اپنے دستِ قدرت پر

وَكُنْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ مُلْقًى بِنَارِهِ ۳۲ وَمَا بَرَدَ النِّيرَانُ إِلَّا بِدَعْوَتِي

اور میں ابراہیم کے ساتھ تھا جبکہ وہ آگ میں ڈالے گئے اور آگ ٹھنڈی نہ ہوئی مگر میری دعا سے

أَنَا كُنْتُ مَعَ رَاعِي الذَّبِيحِ فِدَاءَهُ ۳۳ وَمَا نَزَلَ الْكَبْشَانِ إِلَّا بِفُتُوَّتِي

میں اسمٰعیل کے والد کے ساتھ تھا انکے فدیہ کے وقت اور مینڈھا نازل نہ ہوا مگر میری ہی جوانمردی کے سبب

أَنَا كُنْتُ مَعَ يَعْقُوبَ فِي غَشْوِ عَيْنِهِ ۳۴ وَمَا بَرِئَتْ عَيْنَاهُ إِلَّا بِتَفْلَتِي

میں یعقوب کے ساتھ تھا جبکہ ان کی آنکھ بند ہوگئی اور نہیں لوٹ آئیں ان کی آنکھیں مگر میرے لعاب دہن سے

أَنَا كُنْتُ مَعَ إِدْرِيسَ لَمَّا ارْتَقَى الْعُلَا ۳۵ وَأَقْعَدْتُهُ الْفِرْدَوْسَ أَحْسَنَ جَنَّتِي

میں ادریس کے ساتھ تھا جبکہ وہ بلندی پر چڑھے اور میں نے ان کو اپنی بہترین جنت میں بٹھادیا ،

أَنَا كُنْتُ مَعَ مُوسَى مُنَاجَاةَ رَبِّهِ ۳۶ وَمُوسَى عَصَاهُ مِنْ عَصَايَ اسْتَمَدَّتِ

میں موسیٰ کے ساتھ تھا جبکہ وہ اپنے رب سے مناجات کرتے تھے اور موسیٰ کا عصا کے لئے استمداد کے عصاؤں میں سے ایک عصا تھا

أَنَا كُنْتُ مَعَ أَيُّوبَ فِي زَمَنِ الْبَلَا ۳۷ وَمَا بَرِئَتْ بَلْوَاهُ إِلَّا بِدَعْوَتِي

میں ایوب کے ساتھ تھا جبکہ وہ آزمائش میں مبتلا تھے اور ان کی بلا دور نہ ہوئی مگر میری دعا سے۔

عـرائس الغـيب وردت إلـى كـهف الكرم بلبل أسـرار العـارفـين هيم أفكار الوالهين، زلزل جـبال عصم العـقول اطلع على مـخبئـات الأسرار يا أرواح المؤمنين طيري إليه بأجنحة الشوق، وصـدق العشق، اطوي في صدق قصدك إليه أذيال بساط البسيطة، اصبري حول شمعة طلبه فراشًا يتهافت حول النور، حومـي حول حـماه بقـوادم أقدام الوله، اطلبي منه مـا طلب آدم ﷺ، ربنا ظلمنا أنفسنا، ﴿وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين﴾ [ص: ١٠٧].

أخبرنا الشيخ الأصيل أبو عبد الله محمـد ابن الشيخ أبي العباس أحمد ابن الشـيخ أبي إسحـاق إبراهيم بن أبي عـبد الله بن علي الطبـري الأصل، الجوي المولد والدار بالقاهرة سنة تسع وستين وستمائة.

قال: أخبرنا أبي أحمد بجوى سنة خمـس عشرة وستمائة، والشيخ نور الدين أبو عبـد الله محمـد الجيلي الأصيل، القـزويني بها سنة ثماني عـشرة وستمائة.

قال: قالا: لما اشـتهـر أمر الشـيخ محـيي الدين عبد الـقادر ﷺ في البلاد، قـصد زيارته ثلاثة مـشايخ من جـيلان، فلما دخلوا بـغداد وأتوا إلى مدرسته استـأذنوا عليه فوجدوه جالسًا وبيده كتاب، ورأوا إبريقـه متوجهًا إلى غيـر جهة القبلة، والخـادم واقف بين يديه فنظر بعضـهم إلى بعض كالمنكرين على الشيخ بسبب الإبريق، وتفريط الخادم فيه، فوضع الكتاب من يده، ونظر إليهم نظرة، ونظر إلى الخادم نظرة، فوقع مـيتًا، ونظر إلى الإبريق نظرة فدار وجهـه إلى القبلـة، قالا: وحضـر عنده بمدرسـته ببغـداد سنة ست وأربعين وخمـسمائة الشـيخ بقا بن بطو، والشيخ علي بن الهـيتي، والسـيد الشريف الشيخ أبو سعيد القيلوي، والشيخ مـاجد الكردي ﷺ أجمعين، فأمر الشيخ خادمه أن يمد السماط، فلما هيـأه وأخذوا في الأكل قال لخادمه: اقعد وكل، قال: أنا صائم، قـال: كل ولك أجر صوم يوم، قال: أنا صـائم، قال: كل ولك أجر صـوم أسبوع، قال: أنا صـائم، قال: كل ولك أجر صوم شـهر، قال: أنا صائم، قـال: كل ولك أجر صوم سنة، قال: أنـا صائم، قال: كل ولك أجر صوم الدهر، قال: أنا صائم. فنظر إليه مـغضبًا فـسقط إلى الأرض

وانتفخ جسده وتقطر قيحًا ودمًا، فشفع فيه المشايخ الحاضرون وسكنوا غضبه عليه حتى رضي عنه، فعاد كما كان كأن لم يكن به شيء.

ومما جمعت من كلامه ﷺ في التنزيه: ربنا الله القريب في علوه، المتعالي في دنوه، باريء الخلق بقدرته، ومقدر الأمور بحكمته، والمحيط بكل شيء بعلمه، تمت كلمته، وعمت رحمته، لا إله إلا هو، وكذب العادلون به ومن ادعى له ندًا، أو اعتقد له شبيهًا أو سميًا، سبحان الله عدد خلقه وزنة عرشه ورضاء نفسه ومداد كلماته، ومنتهى علمه وجميع ما شاء وخلق وذرأ، وبرأ، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، الملك القدوس، العزيز الحكيم، واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شبيه له ولا نظير، ولا عون ولا ظهير، ولا شريك له ولا وزير، ولا ند ولا مشير، ليس بجسم فيمس، ولا جوهر فيحس، ولا عرض فينتفى، ولا ذي تركيب فيتبعض، ولا ذي آلة فيمثل، ولا ذي تأليف فيكيف، ولا ذي ماهية مخيلة فيحدد، ولا طبيعة من الطبائع، ولا طالع من الطوالع، ولا ظلمة تظهر، ولا نور يزهر، أحاط بالأشياء علمًا من غير ممازجة، شاهد لها اطلاعًا من غير مماسة، قاهر حاكم، قادر راحم، غافر ساتر، خالق فاطر، فرد معبود، حي لا يموت أزلي لا يفوت، أبدي الملكوت، سرمدي الجبروت، قيوم، لا ينام عزيز لا يضام، منيع لا يرام، له الأسماء الحسنى والصفات العلى والمثل الأعلى، والجد الأبقى، لا تصوره الأوهام ولا تقدره الأفهام، ولا يدرك بالقياس، ولا يمثل بالناس، ولا تكيفه العقول، ولا تحده الأذهان، جل أن يشبه بما صنعه، أو يضاف إلى ما اخترعه، محصي الأنفاس، قائم على كل نفسٍ بما كسبت، لقد أحصاهم وعدهم عداً وكلهم آتية يوم القيامة فردًا، يُطْعِمُ ولا يُطْعَمُ، يرزِق ولا يُرزَق، يجير ولا يُجار عليه، خلق ما ابتدع لا لاجتلاب نفع ولا لدفع ضر، ولا لداعٍ دعاهُ، ولا لفكرٍ حدث لهُ، بل إرادة مجردة عن تغيرات الحدثان، فهو المنفرد بالقدرة على اختراع الأعيان، وكشف الضر وإزالة البلوى، وتقليب الأعيان، وتغير الأحوال، يسوق ما قدر إلى ما وقت، لا معين له في تدبير

স্ক্যান নং – ১২ (ক)

عندنا بالزاوية بلالش، فوثب قضيب البان وخرج، فقلت له: هل لك في الصحبة.

قال: نعم يا أخي، بشرط ستر الحال، قلت: نعم، فمشينا غير بعيد، فأتينا إلى مدينة لا أعرفها، ولا أدري بأي أرض هي. فقام إليه أهلها وتلقوه، وبالغوا في إكرامه، وإذا هم من أكمل الناس أدبًا، وأوفرهم عقلاً، وأكثرهم خشوعًا، فصلى بهم الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والصبح. وخرجنا من عندهم وقت الإسفار، وما أكلنا ولا شربنا، فسار غير بعيد وصار يلقمني من أنواع الفواكه والحلواء، وسقاني ماء، فوالله ما أكلت ولا شربت ألذ مما أطعمني قضيب البان وسقاني. ولقد خرجنا من تلك المدينة، وما معه شيء، فلم يكن إلا يسيراً حتى أتينا لالش. فقلت له: ما هذه المدينة التي كنا بها؟ قال لي: يا أخي هذه مدينة وراء بحر الهند، أهلها مسلمون، يصلي بهم كل يوم ولي من أولياء ذلك الزمان، وإنه لا يدخلها عليهم إلا ولي ولو لم يؤذن لي في مصاحبتك لما استطعت أن ترافقني.

أخبرنا الشيخ الصالح سيف الدين أبو بكر بن أيوب بن الحسين الدنيسري. قال: سمعت شيخنا الشيخ العارف أبا عبد الله يونس البيطار، الدنيسري بها. يقول: كنت في بدايتي أعمل البيطرة بدنيسر، فكنت يومًا أنعل بغلاً، وضربني في رأسي بحافره، فغشي عليّ، وتكلم بعض الناس بموتي، واتصل الخبر بأمي أني مت، وكانت بالموصل، فقالت لقضيب البان: قد جاءني الخبر بموت ابني. فقال لها: لم يمت ابنك، بل ضربه بغل بحافره في رأسه، وغشي عليه، فجاءت أمي وأخبرتني بما قال لها قضيب البان ﷺ. وبه إلى الشيخ يونس البيطار.

قال: سمعت الشيخ أبا حفص عمر بن مسعود البزار ببغداد، يقول: ذكر قضيب البان عند شيخنا الشيخ محيي الدين عبد القادر ﷺ. فقال: هو ولي مقرب، ذو حال مع الله، وله قدم صدق عنده عز وجل، فقيل له: إنا لا نراه يصلي. فقال: إنه يصلي من حيث لا ترونه، ولا يخرج يوم وليلة، وعليه

স্ক্যান নং – ১২ (খ)

منهما فرض أبداً، وإني أراه إذا صلى بالموصل أو بغيرها من آفاق الأرض يسجد عند باب الكعبة.

سكن ﷺ بالموصل، واستوطنها إلى أن مات بها قريبًا من سنة سبعين وخمسمائة، وبها دفن. وكان ببلاد المغرب رجل آخر؛ يسمى قضيب البان أيضًا، وهو بعد هذا الذي ذكرناه هنا ﷺ.

أخبرنا الشريف أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الخضر الحسيني الموصلي، قال: سمعت أبي رحمه الله تعالى، يقول: رأيت قضيبَ البان الموصلي غير مرة، يجلس بين يدي الشيخ محيي الدين عبد القادر ﷺ، متواضعًا متصاغراً. وسمعته يقول: الشيخ محيي الدين عبد القادر ﷺ، قائد ركب المحبين، وقدوة السالكين، وإمام الصديقين، وحجة العارفين، وصدر المقربين في هذا الوقت ﷺ أجمعين.

الشيخ مكارم النهر خالصي ﷺ

هذا الشيخ من أكابر مشايخ العراق المشهورين، وأجلاء العارفين المذكورين، ونبلاء الأولياء المقربين. صاحب الكرامات الظاهرة، والأحوال الفاخرة، والأفعال الخارقة، والمقامات الرفيعة، والإشارات العلية، والأنفاس الملكوتية، والهمم الفخيمة. صاحب الفتح السني، والكشف الجلي، والسر المضي. له المراتب المصدرة في مواطن القدس، والمكانة الجليلة في مجالس القرب، والطور الأرفع في الحقائق، والمنهاج الأعلى في المعارف، والنظر الخارق في عالم الغيب، والأنفاس الصادقة في حقائق الآيات. وله اليد البيضاء في علوم المنازلات، والباع الرحيب في معاني المشاهدات، والقدم الراسخة في كشف مشكلات الأحوال.

وهو أحد من أظهره الله تعالى إلى الوجود، وصرفه في العالم، ومكنه من الأحوال، وقلب له الأعيان، وأظهر على يديه العجائب الخارقة، وأنطقه بالمغيبات، وأجرى على لسانه الحكم، وملأ صدور الخلق من هيبته، وقلوبهم بمحبته.

رحمه الله تعالى يقول: كنت سيئ الظن بقضيب البان، على كثرة ما بلغني من كراماته ومكاشفاته، وكنت عزمت على أن أكلم السلطان في إخراجه من الموصل، وما اطلع على ذلك مني سوى الله عز وجل. فبينما أنا في بعض أزقة الموصل يومًا، إذ رأيت قضيب البان مقبلاً من صدر الزقاق، على هيئته المعروفة، ولم يكن في ذلك الزقاق أحد غيري وغيره، فقلت في نفسي: لو كان معي أحد أمرته بإمساكه، فمشى خطوة، وإذا هو على هيئة كردي، بصورة غير صورته الأولى. ثم مشى خطوة أخرى، وإذا هو على هيئة بدوي بصورة غير الصورتين الأوليين. ثم مشى خطوة، وإذا هو على هيئة فقيه بصورة غير الصورة المتقدمة. وقال لي: يا قاضي هذه أربع صور رأيتهن فمن هو قضيب البان منها حتى تكلم السلطان في إخراجه؟ فلم أتمالك أن انكببت على يديه أقبلهما، واستغفرت الله.

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبي الحسن علي بن حسين الدمشقي، الموصلي. قال: أخبرنا الشيخ الأصيل أبو المفاخر عدي ابن الشيخ أبي البركات صخر بالموصل. قال: سمعت أبي رحمه الله تعالى، يقول: مكث قضيب البان عندنا في الزاوية شهراً مستغرقًا لا يأكل ولا يشرب، ولا يضع جنبه على الأرض، وكان عمي الشيخ عدي ﷺ، يأتي إليه، ويقف على رأسه، ويقول: هنيئًا لك يا قضيب البان، قد اختطفك الشهود الإلهي، واستغرقك الوجود الرباني. وكان يقول لمن ورد: سلم على ولي الله حقًا، يشير إليه. قال: وصلى يومًا معنا صلاة الصبح، خلف الإمام، فأتمّ منها ركعة، وقطع الثانية، وجلس إلى ناحية عنا. فلما انصرفنا من الصلاة أتيته، وقلت له: يا قضيب البان لما لا تتم الصلاة معنا. قال: يا أبا البركات تعبت من عدوي خلف إمامكم، إنه أحرم بالصلاة هنا، ثم سافر إلى الشام، ثم جاء إلى بغداد، ثم انصرف إلى مكة، فلما جئنا إلى العقبة، تعبت فتركته، قال: فأتيت الإمام وسألته عن ذلك، فقال: صدق والله، لقد كان وسواسي في صلاتي بهذا كله، يريني في الركعة الثانية أني صاعد في العقبة. قال: وحكى إليّ الشيخ الصالح أبو حفص عمر العدني. قال: أذن الظهر يومًا،

و نقل است که شیخ ابوسعید ابوالخیر مریدی را که اندیشه حج بود به سر خاک پیر ابوالفضل فرستاد و
گفتی آن خاک را زیارت کن و هفت بار گرد آن بگرد و طواف آن خاک کن تا همه مقصود حاصل
شود انتهی در نفحات مذکور است و هم درین کتاب است که روزے ابو علی سلوی را دیدند
که در وقت گرمی و عین گرد و غبار میرفت پرسیدند که کجا میروی گفت بفلان خانقاه میروم
که آنجا درویشانند و من نوشته دیده ام که در روز سه صد و بیست رحمت از آسمان بر
درویشان بارد و تخصیص در وقت قیلوله لهذا آنجا میروم که قیلوله کنم تا باشد که از آن رحمت
بر من نیز بارد و بزرگان گفته اند که خویشتن را از میان ایشان در خور آن و خویش را از ایشان
واز دوستان ایشان فرا نما اگر چه دانی که چگونه رسوائی تا فردا گویند که ذکر کیستی گوئی من از
دوستان ایشانم و چون سخن ایشان شنوی اگر چه معنی ندانی سر جنبان تا فردا گوئی از محبان
ایشانم گویند بیا ترا حقی ست مگر بدان سبب برهی انتهی شیخ ابو زرعه رازی را گفتند به روز
طلب بکن گفت من هیچ مایه ندارم بغیر ازآن که درویشان از سخن من می خندند فقط و مولانا
رکن الدین خوافی گفت که من از هیچ کار خود امیدوار ترنیستم الا از یک کار که نجات امید دارم
و آن اینست که روزے در صحرائی خدمت شیخ رکن الدین کلال که از مشائخ بزرگ شیراز بود و
بطهارت مشغول بود و من کلوخ استنجای وی از رخساره خود سوده م تا بدان استنجا کرد و مولوی
روم گفت که با اولیای حق زانو بزانو باید نشست که آن از اثر هاست عظیم و در خبر است که
روز قیامت بنده تو رسیده آمده باشد از مفلسی کردار خود پس حق تعالی گوید ای بنده من تو فلان
دانشمند را و فلان صحابی شناختی و فلان عارف را می شناختی گوید می شناختم پس حکم شود
که برو ترا بوی بخشیدم سبحان الله وقتیکه شناخت نسبت پیوندی یابد و سبب نجات میگردد
بهر دوستان وی سیرت گرفتن در پی بروی بهتر و اولی لهذا هر یک خود را در یک سلسله منسلک
میسازد انتهی صاحب فواد الفواد گوید که من روزے طفلی را که جنبش آن آزار سیده و پیش شیخ خود
برده بودم تا وی سوی بسویش بنظر رحمت دیده دعا کرد که بهتر خواهد شد بعده درین محل حکایت کرد

۵۷۔ بعض ولیوں کو نبی پر جزئی فضیلت ہوتی ہے!

ولی جو کمال بھی حاصل کرتا ہے اور جس درجہ تک بھی پہنچتا ہے وہ اپنے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیروی کے طفیل تک پہنچتا ہے۔ اگر نبی کی متابعت اور پیروی سے ہٹ جائے تو ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ بلند ترین درجات تک پہنچنا تو بڑی بات ہے۔ لہٰذا اگر ولی کو چند جزئی فضیلتوں میں سے کوئی ایسی فضیلت حاصل ہو جائے جو نبی میں نظر نہیں آتی تھی اور اس ولی کو بلند درجات میں سے کوئی خاص درجہ میسر ہو بھی جائے جو نبی کو میسر نہیں تھا پھر بھی یقیناً نبی کو بھی اس جزئی فضیلت اور اس خاص درجے سے پورا پورا حصہ حاصل ہوتا ہے کیونکہ ولی میں اس کمال کا حصول تو اس نبی کی پیروی ہی کے واسطے سے ہے اور یہ سب کچھ اس نبی کی اتباع سنت کے نتائج ہی کا ایک حصہ ہے۔ پس لامحالہ نبی کو اس کمال سے مکمل حصہ حاصل ہوگا۔ جیسا کہ حضور انور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ مَنْ سَنَّ سُنَّۃً حَسَنَۃً فَلَہٗ اَجْرُھَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِھَا (جس کسی نے کسی اچھے طریقے کی بنیاد رکھ دی تو اسے خود اس کا ثواب بھی اسے ملتا رہے گا اور تمام لوگوں کے برابر بھی ثواب ملے گا جو اس طریقے پر عمل کریں گے) ایسا ولی اس کمال کے حصول میں پیشرو ہوگا اور اس درجے تک پہنچنے میں مقدم ہوگا۔ اور ولی کی نبی پر اس قسم کی فضیلت حاصل ہونے کو علماء نے جائز قرار دیا ہے کیونکہ یہ جزئی فضیلت ہے جو کلی فضیلت کے مقابلہ میں ہیچ ہے۔ اور وہ جو صاحبِ فصوص الحکم حضرت محی الدین ابن عربی نے فرمایا کہ خاتم انبیاء (صلی اللہ

لہ، حضرت شیخ محی الدین محمد بن علی ابن عربی قدس سرہ، ۱۷ رمضان ۵۶۰ھ اندلس کے مشہور شہر مرسیہ میں پیدا ہوئے اور ۲۲ ربیع الآخر ۶۳۸ھ میں وفات پائی۔ علوم ظاہری

عبارت میں اشامات کر دکھایا ہو ◆

چنانچہ مروی ہے کہ ایک دن حضرت سید البشر صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس لگائے ہوئے تھے۔ اور قریش کے سردار اور کفار کے رئیس بھی اس مجلس میں حاضر تھے۔ اور بہت سے اصحاب کرام بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت سید البشر صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ والنجم پڑھنی شروع کی جب ان کے باطل خداؤں کا ذکر آیا تو آنحضرت صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کے ساتھ شیطان نے اپنا کلام اس طرح ملا دیا کہ حاضرین نے اس کو آنحضرت صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا کلام سمجھا۔ اور باہم میں کچھ تمیز نہ کر سکے۔ تو کافروں نے جو وہاں موجود تھے شور مچایا۔ اور کہنے لگے کہ محمد صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ صلح کر لی ہے۔ اور ہمارے بتوں کی تعریف کی ہے۔ حاضرین اہل اسلام بھی اس کلام سے متحیر ہو گئے۔ اور آنحضرت صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیطان لعین کے کلام سے اطلاع نہ ہوئی۔ فرمایا کہ یہ کیا واقع ہے۔ اصحاب کرام نے عرض کی کہ اثنائے کلام میں اس قسم کے فقرے حضور علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہیں۔ آنحضرت صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت متفکر اور غمناک ہوئے۔ اسی اثنا میں جبرئیل امین علے نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام حاضر ہوئے اور وحی لائے کہ وہ کلام القائے شیطانی تھا۔ اور کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گذرا ہے۔ جس کے کلام میں شیطان نے القا نہ کیا ہو۔ پس ازاں اللہ تعالے نے اس کو رد کیا ہے۔ اور اپنے کلام کو محکم کیا ہے ◆

پس جب آنحضرت صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بیداری کے وقت صحابہ کی مجلس میں شیطان لعین نے اپنے کلام باطل کو آنحضرت صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں القا کر دیا۔ اور کسی نے تمیز نہ کی تو آنحضرت صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خواب کی حالت میں جو حواس کے معطل و بیکار ہونے کا محل اور شک و شبہ کا مقام ہے باوجود دیکھنے والے کی تنہائی کے کہاں سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ القائے شیطانی کے تصرف اور مکر و فریب سے محفوظ اور مامون ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ نعتیہ قصیدوں کے پڑھنے اور سننے والوں کے ذہن میں متمکن ہو چکا تھا کہ آنحضرت صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل سے راضی ہیں جیسے کہ ممدوح اپنی مدح کرنے والوں سے راضی ہوتے ہیں۔ اور یہ معنے ان کی قوت متخیلہ میں منتقش ہو گئے ہوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ واقع میں انہی کی اپنی متخیلہ صورت کو دیکھا ہو۔ بغیر اس بات کے کہ وہ واقع حقیقی ہو یا تمثل شیطانی۔ اور نیز واقعات اور رؤیائے صادقہ کبھی ظاہر پر محمول ہوتے ہیں۔ اور ان کی حقیقت وہی ہے جو دیکھنے والے نے دیکھی ہے۔ مثلاً زید کی صورت کو خواب میں دیکھا ہے اور مراد اس سے عمرو رکھا ہے۔ اس مناسبت کے لحاظ

حقیقت محمدی کی حقیقت کعبہ تک رسائی

یہ بات ذہن نشین کرلیں۔ جس طرح کعبہ کی ظاہری صورت چیزوں کی صورتوں کی مسجود ہے (ہر مخلوق کعبۃ اللہ کو سجدہ کرتی ہے) اسی طرح تمام اشیاء کے حقائق بھی حقیقت کعبہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ کعبۃ اللہ مسجود خلائق بھی ہے اور مسجود حقائق بھی میں یہاں ایسا نکتہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو آج تک نہ آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا اور نہ پہلے بزرگوں نے اسے بیان فرمایا ہے۔ یہ نکتہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے بتایا ہے اور اس کا خصوصی الہام مجھ پر ہی عنایت ہوا ہے ایک ہزار سے کچھ سال زیادہ گزر گئے ہیں — حضور سید الانبیاء کی رحلت ہوئی آج وہ وقت آگیا ہے جب حقیقت محمدی عروج کر کے حقیقت کعبہ تک رسائی کر رہی ہے آج حقیقت محمدی اپنے عروج سے حقیقت کعبہ میں متحد ہو گئی ہے۔ آج سے حقیقت محمدی کا دوسرا نام حقیقت احمدی ہوگا اور ذات احد کا مظہر بن جائے گا۔ یہ دونوں مبارک نام (محمد۔ احمد) حقیقت محمدی اور حقیقت کعبہ میں یکجا ہو جائیں گے۔ حقیقت محمدی کا پہلا مقام خالی ہو جائے گا اور یہ مقام اس وقت تک خالی رہے گا۔ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے اور نزول فرمانے کے بعد شریعت محمدی کے مطابق عمل کریں گے اس وقت حقیقت عیسوی عروج کر کے حقیقت محمدی کی جگہ کے خلا کو پُر کرے گی ۲؎

جگر کے خلا کو پُر کرے گی۔ پڑ

سنہ : ۔ حضرت مجدد الف ثانی کے مقام سلوک کا اندازہ صرف اسی ایک لطیف نکتہ سے لگایا جاسکتا ہے۔ آپ نے حقیقت محمدی حقیقت کعبہ اور حقیقت عیسوی کے بلند مراتب و مقامات کی نشاندہی کی ہے۔ حقیقت انسانی کی اصل حقیقت محمدی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا پہلا القاء حقیقت محمدی پر ہی ہوا تھا۔ اول ما خلق اللہ نوری (سب سے پہلے میرا نور تخلیق کیا گیا) "میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تمام مخلوقات سے اسبق اور تمام موجودات سے اول آپ کی ہی ذات تھی آپ ہی مخلوق اول اور بلحاظ ظہور آخر تھے۔ آپ ہی خلق اول۔ یقین اول۔ برزخ کبریٰ۔ رابطہ بین الظہور والبطون ہیں۔ آپ اللہ کا وہ نور ہیں جو سب سے پہلے چمکا اور آپ کے انوار سے مخلوقات کا ظہور ہوا تھا۔ آپ خلاصہ موجودات ہیں۔ آپ جان عالم ہیں۔ آپ اسمائے الٰہیہ کا اجمال ہیں۔ آپ ذاتِ خداوندی کا مظہر ہیں آپ ہی عقل اول ہیں آپ ہی نور نبوت ہیں آپ ہی حقیقت آدم ہیں آپ ہی اصل انبیاء ہیں۔ جسطرح آدم علیہ السلام پر تخلیق کائنات ہوئی اسی طرح آپ کی آمد پر تکمیل انسانی ہوئی۔ نور مصطفیٰ ہی عقل اول ہے۔ قلم اول ہے۔ مخلوقات کے تمام ظاہری و باطنی حقائق آپ کے نور میں پوشیدہ ہیں۔ اسی نور سے چاند سورج روشن ہوئے۔ اسی نور سے عرش و کرسی ہے۔ اسی نور سے آسمانوں کے تاروں میں روشنی آئی اسی نور سے زمینوں کو جان ملی۔ یہی نور ربانی قلب آدم میں جلوہ گر ہوا اور یہی امانت نور آمنہ کی گود میں درخشاں ہوا۔ یہی نور صورت محمدی ہے اور یہی نور حقیقت محمدی کہلایا۔

لباس البشر پوشیدہ بجود ملک گشتم ! ۔۔۔ بہ تصویر محمد حامد و محمود بودستم !
گہے ادریس گاہے شیث گاہے نوح گاہ یونس ۔۔۔ گہے یوسف گہے یعقوب گاہے ہود بودستم
گہے صالح گہ ابراہیم گہ اسحق گاہ یحییٰ ۔۔۔ گہے عیسیٰ گہے موسیٰ گہے داؤد بودستم
بنائے میکشاں امروز لقد وقت شان گشتم ۔۔۔ ز دیگراں روز جزا موعود بودستم !

انتكاس صورته من حضرة خاصة ، وقد تعطيه عـين [١] ما يظهر [١] منها فتقابل اليمينُ منها اليمينَ من الرائي ، وقد [٢] يقابل اليمينُ اليسارَ وهو الغالب في المرايا بمنزلة العادة في العموم : ويخرق العـادة بقابل اليمينُ اليمينَ ويظهر الانتكاس . وهذا كله من أعطيات حقيقة الحضرة المتجلّى فيها التي (١٥—ب) أنزلناها منزلة المرايا . فمن عرف استعداده عرف قبوله ، وما كل من عرف قبوله يعرف استعداده إلا بعد القبول ، وإن كان يعرفه مجملاً . إلا أن بعض أهل النظر من أصحاب العقول الضعيفة يرون أن الله ، لـمّا ثبت عندهم أنه فعّال لما يشاء ، جوزوا على الله تعالى ما يناقض الحكمة وما هو الأمر عليه في نفسه . ولهذا عدل بعض النظار [٣] إلى نفي الإمكان وإثبـات الوجوب [٤] بالذات وبالغير . والمحقق يثبت الإمكان ويعرف حضرته ، والممكنَ ما هو الممكن ومن أين هو ممكن وهو بعينه واجب بالغير ؛ ومن أين صح عليه اسم الغير الذي اقتضى له الوجوب . ولا يعلم هذا التفصيل إلا العلماء بالله خاصة .

١٢ وعلى قدم شيث [٥] يكون آخر مولود يولد من هذا النوع الإنساني . وهو حامل أسراره ، وليس بعده ولد في هذا النوع . فهو خاتم الأولاد . وتولد معه أخت له فتخرج قبله ويخرج بعدها يكون [٦] رأسه عند رجليها . ويكون مولده بالصين ولغته لغة أهل [٧] بلده . ويسري العقم في الرجال والنساء فيكثر النكاح من غير ولادة ويدعوهم إلى الله فلا يجاب . فإذا قبضه الله تعالى وقبض مؤمني زمانه بقي من بقي مثل البهائم لا يحِلّون حلالاً ولا يحرمون حراماً ، يتصرفون بحكم الطبيعة (١٦ — ا) شهوة مجـردة عن العقل والشرع فعليهم تقوم الساعة .

(١ — ١) ساقطة في ن (٢) ب : قد (٣) ن : + من أصحاب العقول
(٤) ن : الوجود (٥) ا : + عليه السلام (٦) ن : فيكون (٧) ن : ساقطة .

স্ক্যান নং – ১৯

اورکمان سے اسپر اسم غیر صحیح ہوا جو اوسکے لئے وجوب کو مقتضی ہے اور اس تفصیل کو خاصکر
اللہ والے عالم سمجھتے ہین اور اس نوع انسانی مین شیث علیہ السلام کے قدم بقدم ایک
لڑکا پیدا ہوگا اور اونکے اسرار کا وہی حامل ہوگا اور اوسکے بعد اس نوع انسانی مین پھر لڑکا نہوگا
اور وہی لڑکا خاتم اولاد ہوگا اور اوسکے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوگی - یہ لڑکے سے پہلے
پیدا ہوگی اور لڑکا اوس سے پیچھے پیدا ہوگا - اور لڑکے کا سر لڑکی کے دونون پیرونکے
پاس ہوگا - اور اوسکی ولادت چین مین ہوگی اور اوسکی زبان اوس شہر کی زبان ہوگی
اور اسکے بعد مرض بانجھ مردون اور عورتون مین سرایت کریگا - اور بغیر توالد اور تناسل
کے نکاح کی بڑی کثرت ہوگی اور وہ لڑکا اونکو خدا کی طرف بلاوے گا لیکن کوئی قبول نکریگا -
اور جب اللہ اوسکو اور اوس زمانہ کے مومنون کو اوٹھا لیویگا تو باقی لوگ مثل چارپایے
اور بہائم کے رہ جاوینگے نہ حلال کو حلال جانینگے اور نہ حرام کو حرام سمجھینگے - اور طبیعت
کے حکم سے شریعت اور عقل سے خالی ہوکر شہوت رانی مین تصرف کرینگے پھر اونھین پر
قیامت قائم ہوگی -

تیسری حکمت سبوحی کی فص کلمہ نوحیہ مین ہے

جاننا چاہیے کہ اہل حقائق کے نزدیک جناب الٰہی سے تنزیہ کرنا عین تحدید و تقیید ہے
اور تنزیہ کرنے والا یا جاہل ہوگا یا بے ادب اور جب ان دونون نے مطلقاً تنزیہ کی اور
دونون تنزیہ کے قائل ہوے اور ایسے کا قائل اگر شریعتون پر ایمان لایا ہے اور یہ تنزیہ
کرکے تنزیہ ہی پر ٹھہر گیا - اور سواے تنزیہ کے اور کچھ نہین دیکھتا ہے تو اس نے بے ادبی
کی اور حق تعالی اور تمام انبیا علیہم السلام کو جھٹلایا اور وہ اس بات سے بیخبر ہے اور
خیال کرتا ہے کہ مین علم حقائق حاصل کر رہا ہون حالانکہ وہ علم حقائق کو فوت کر رہا ہے
اور ان لوگون کے مانند ہے جو بعض پر ایمان لاتے اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہین اور
علی الخصوص یہ بات معلوم ہوچکی ہے کہ شرایع الٰہی جب حق تعالی کے بارہ مین کلام کرتی
تو وہ ظاہری مفہومات سے عام خلائق کے لیے ہوتی ہے اور ہر گروہ کے لیے اوسکے
الفاظ کے طریقون سے خاص مفہومات بھی ہین اور وہ لفظ جس زبان مین ہو دونون مفہومات
کو شامل ہوتا ہے اور وہ اوس زبان کا وضعی لفظ ہوتا ہے کیونکہ حق تعالی کو ہر مخلوق مین ایک

স্ক্যান নং – ২০

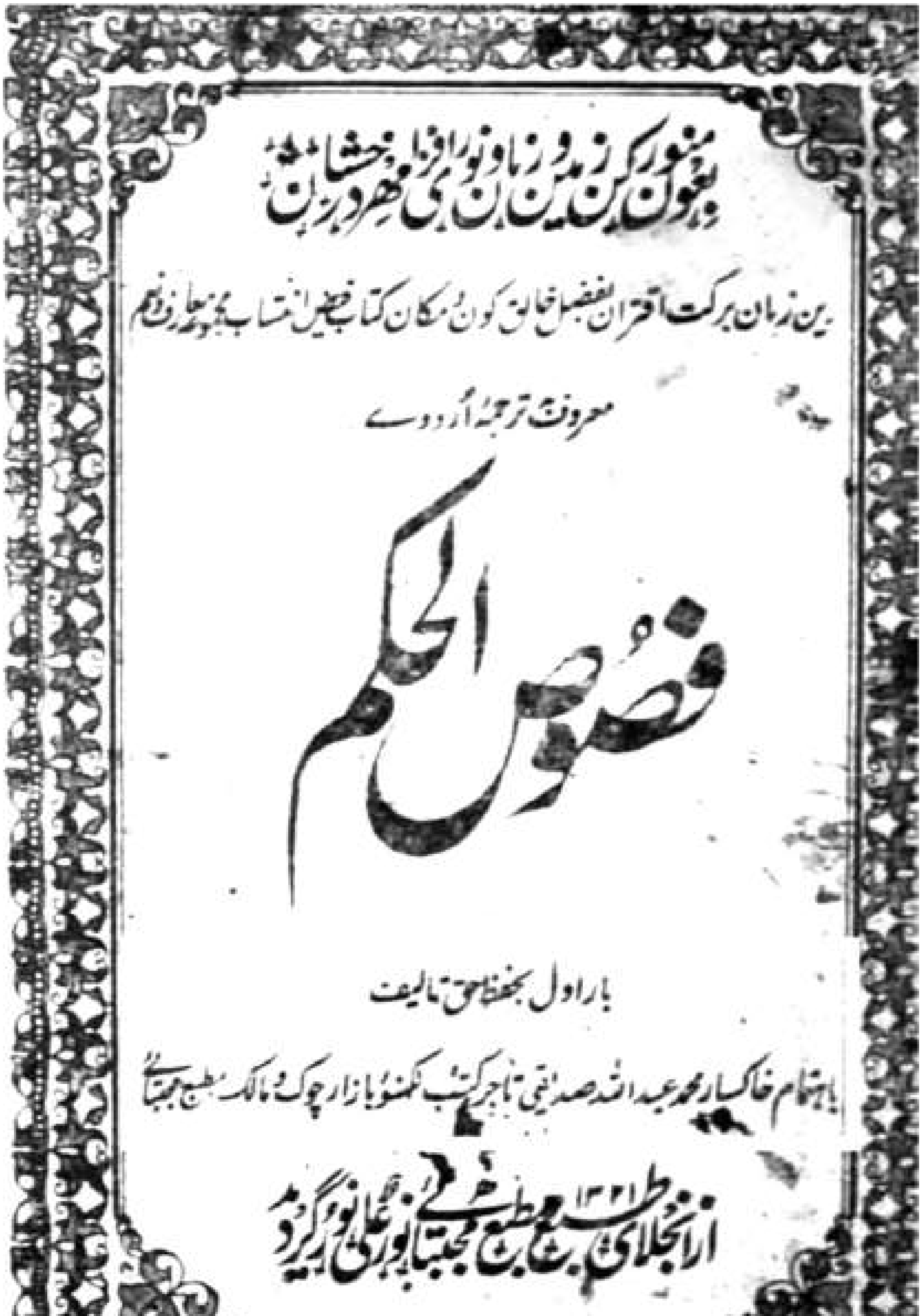

بعون رکن رزین دین زمان و نور افزای مہر درخشان

درین زمان برکت اقتران بفضل خالق کون و مکان کتاب فیض انتساب مجموعہ علوم

معروف ترجمۂ اردو سے

فصوص الحکم

بار اول بحفظ حق تالیف

باہتمام خاکسار محمد عبد اللہ صدیقی تاجر کتب لکھنؤ بازار چوک و مالک مطبع مجتبائی

از انجلای ۱۳۲۱ مطبع طبع مجتبائی بزیور تحلی نو گردید

স্ক্যান নং – ২১

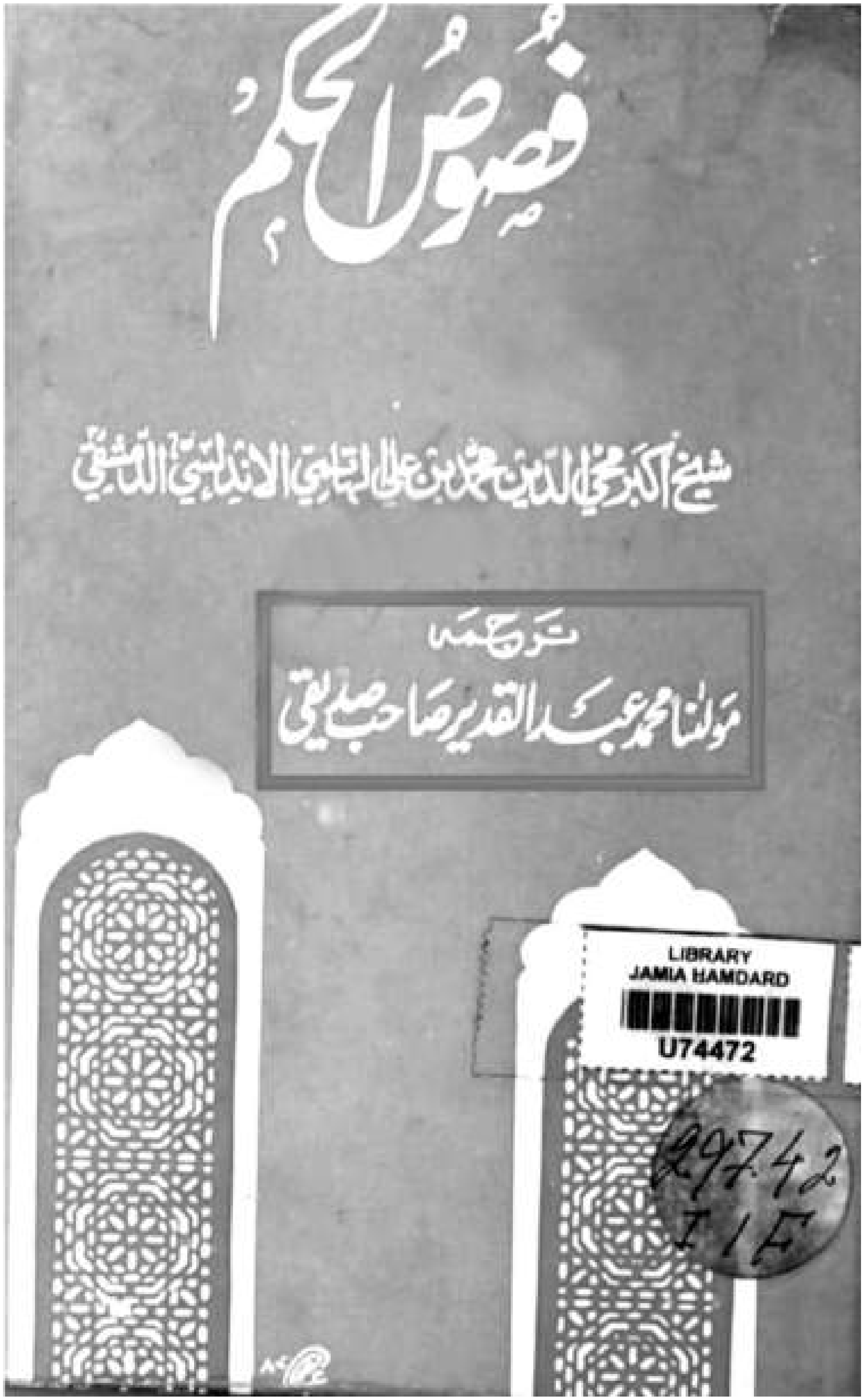
فصوص الحکم
شیخ اکبر محی الدین محمد بن علی الحاتمی الاندلسی الدمشقی
ترجمہ
مولانا محمد عبد القدیر صاحب صدیقی
LIBRARY
JAMIA HAMDARD
U74472
297.42

ليعلم المتجلَّى له أنه [1] ما رآه. وما ثَمَّ مثال أقرب ولا أشبَه بالرؤية والتجلي من هذا . وأجهد في نفسك عندما ترى الصورة في المرآة أن ترى جرْم المرآة لا تراه أبداً البتة (١١ — ب) حتى إن بعض من أدرك مثل هـــذا في صور [2] المرايا ذهب إلى أن الصورة المرئية بين بصر الرائي وبين المرآة . هذا أعظم مـا قدَرَ عليه من العلم ، والأمر كما قلناه وذهبنا إليه . وقد بينا هذا في الفتوحـات المكية وإذا ذقت هذا ذقت الغاية التي ليس فوقها غاية في حق المخلوق. فلا تطمع ولا تتعب نفسك في أن ترقى في[3] أعلى من هذا الدرج [4] فما هو ثَمَّ أصلاً ، وما بعده إلا العدم المحض. فهو مرآتك في رؤيتك نفسك ، وأنت مرآته في رؤيته[5] أسماءه وظهور أحكامها وليست سوى عينه . فاختلط الأمر وانبهم : فمـنا من جهل في علمه فقال : « والعجز عن درك الإدراك إدراك ، ومنا من علم فـلم يقل مثل هذا وهو أعلى القول ، بل أعطاه العلمُ السكوتَ ، ما أعطاه العجز. وهذا هو أعلى عالم بالله. وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء، وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا من (١٢ — ا) مشكاة الرسول الخاتم ، ولا يراه أحد من الأولياء إلا من مشكاة الولي [6] الخاتم ، حتى أن الرسل لا يرونه — متى رأوه — إلا من مشكاة خـــاتم الأولياء : فإن الرسالة والنبوة — أعني نبوة التشريع ورسالته — تنقطعان ، والولاية لا تنقطع أبداً .فالمرسلون ، من كونهم أولياء ، لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم الأولياء ، فكيف من دونهم من الأولياء؟ وإن كان خاتم الأولياء تابعاً في الحكم لمـــا جاء به خاتم الرسل من التشريع ، فذلك لا يقدح في مقامه ولا يناقض مـا ذهبنا إليه ، فإنه من وجه يكون أنزل كما أنه من وجه يكون أعلى . وقد ظهـــر في ظاهر شرعنا مـا يؤيد

---

(١) ب : إنما (٢) ب : صورة (٣) ن : ساقطة (٤) ن : في الأصل المرقى ، صححت إلى الدرج في الهامش (٥) ن : رؤيتك (٦) ب : خاتم الولي .

فلا نبي بعده : يعني مشرّعاً أو مشرّعاً له ، ولا رسول وهو المشرع . وهـــذا الحديث قَصَمَ ظهور أوليـــاء الله لأنه يتضمن انقطاع ذوق العبودية الكاملة التامة . فلا ينطلق عليه اسمها الخاص بها فإن العبد يريد أَلّا يشارك سيده — وهو الله[1] — في اسم ؛ والله[1] لم يتسمّ[2] بنبي ولا رسول ، وتسمى بالولي واتصف بهذا الاسم فقال «الله[3] ولي الذين آمنوا» : وقال «وهو الولي الحميد» . وهذا الاسم باقٍ جار على عباد الله دنيا وآخـرة . فلم يبق اسم يختص به العبد دون الحق بانقطاع النبوة والرسالة : إلا أن الله لَطَفَ[4] بعباده ، فأبقى لهم النبوة العامة التي لا تشريع فيها ، وأبقى لهم التشريع في الاجتهـــاد في ثبوت الأحكام ، وأبقى لهم الوراثة في التشريع فقال «العلماء ورثة الأنبياء» . وما ثَمَّ ميراث في ذلك إلا فيما اجتهدوا فيـــه من الأحكام فشرّعوه . فإذا رأيت النبي يتكلم بكلام خارج عن التشريع فمن حيث هو ولي[5] وعارف ، ولهذا ، مقامه (٥٥ — ب) من حيث هو عـــالم أتم وأكمل من حيث هو رسول أو ذو تشريع وشرع . فإذا سمعت أحداً من أهل الله يقول أو ينقل إليك عنه أنه قال الولاية أعلى من النبوة ، فليس يريد ذلك القائل إلا ما ذكرناه . أو يقول إن الولي فوق النبي والرسول ، فإنه يعني بذلك في شخص واحـــد : وهو أن الرسول عليه السلام — من حيث هو ولي — أتم من حيث هو نبي رسول[6] ؛ لا أن الولي التابع له أعلى منه ، فإن التابع لا يدرك المتبوع أبداً فيما هو تابع له فيه[7] ؛ إذ لو أدركه لم يكن تابعاً[8] له فافهم . فرجع الرسول والنبي المشرع إلى الولاية والعلم . ألا ترى الله تعالى قد أمره بطلب الزيادة من العلم لا من غيره فقال له آمراً «وقل[9] رَبِّ

---

(١) ا : + تعالى (٢) ب : لم يسم — ا : لا يتسمى (٣) ن : ساقطة

(٤) ب : لطيف لطف — ن : لطيف بعباده (٥) الواو ساقطة في ب

(٦) ن : ورسول (٧) ب : ساقطة (٨) ا : تابع (٩) «ب» و «ن» : قل من غير الواو

الإيمان ، أساس الخير كله الإيمان ، والإخلاص أساس النبوة ، والنبوة أساس الرسالة وهو أساس الولاية والبدلية والغيبية والقطبية .

لما مات على بن الفضيل بن عياض رآه أبوه فى المنام فقال له مافعل الله بك ؟ قال ياأبت ما رأيت للعبد خيرا له من ربه ، يابنى عليك بالله لاتشتغل بغيره الدار داره والأرزاق خلقه (وقدر فيها أقواتها) الملائكة يوكلون بأرزاقك الخير منه والشر منه يرى العبد بسهام الآفات حتى إذا غمض العبد عينيه عن الرى جاء طبيب القرب داوى جرحه وطبيب الخير رفعه وطبيب الشوق ضمه ، البداية بالمكاره ، إذا كانت الجنة محفوفة بالمكاره فكيف يكون قرب الحق عز وجل ؟ المؤمن عامل الملك فى قربة الدنيا إذا صار السر سماء والقلب أرضا يطعم القلب من سور سماء السر ، إذا شاء جمع بينهما ثم رأى رحمة الله عليه قريبا ومديده كأنه يعانق شيئا ثم قال يا أهل المجلس اعذرونا أنا فى قيد الحال فى قيد من يوم أنا أخرس أنا أصم ؛

رأيت أبى آدم عليه السلام فقال : يابنى صححت نسبى الوحشة لابد منها ، إذا نزل بك الموت قطعك كل مواصل ، وهجرك كل قريب فاهجرهم قبل هجرهم واقطعهم ، فيكون القبر طريقا إلى الحق دهليزا ، مت قبل أن تموت ، مت عنك وعنهم وقد حييت به تصير كالميت ويد السابقة تلقمه وتقلبه يأخذ قسمه من غير همة ، إذا تم هذا جاءت الحياة بقرب الله عز وجل والعلم به ، يتنحى هذا الطائر لايبالى قامت القيامة أو لم تقم خلق الموت أو لم يخلق عنده شغل وصل إلى الحق ، وأما الأحكام فهى محفوظة محروسة ، سبحان من سيركم بالحكم وفصحكم بالعلم يتلبس أحدكم بزى الصالحين زرقة وصوف وهو عندنا كافر ، قد يأكل العبد من كسبه ويقوى إيمانه فيحرم عليه أن يأكل من كسبه يقال له افتح خزانة التكوين خذ من خزائن العلم ، قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم :

« تَفَرَّغُوا مِنْ هُمُومِ الدُّنْيَا مَا اسْتَطَعْتُمْ » .

أكثر من ذكر الموت وما وراءه والصراط وما وراءه اذكر الآخرة بنعيمها أو عذابها تفرغوا من الدنيا بالشغل مع الله عز وجل بطهارة القلوب والأسرار ومجاهدة النفوس ومحاربة الشياطين ، تحرروا لله تعالى وانقطعوا إليه ، التوحيد إعدام الخلائق والخروج من انقلاب طبعك إلى طبع الملائكة ثم فناؤك عن طبع الملائكة ولحوق بربك عز وجل يسقيك

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم[1]

رشحات

الحمد للّٰہ الذی رب المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجہ اللّٰہ وصلی اللّٰہ علیٰ خیر خلقہ محمدٍ وآلہٖ واصحابہٖ اجمعین۔ قال اللّٰہ تعالیٰ قل ان کنتم تحبون اللّٰہ فاتبعونی یحببکم اللّٰہ[1]

ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو رب ہے مشرق اور مغرب کا (یعنی تمام جہانوں کا)، پس جس طرف پھر کر دیکھو۔ اللہ کا رخ انور (یعنی ذات باری تعالیٰ) موجود ہے اور درود ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم پر جو بہترین خلق ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی (علیہ الصلوٰۃ والسلام) لوگوں کو کہہ دو کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری (نبی کی) اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ پس اللہ تعالیٰ کے حکم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی ظاہری اور باطنی اطاعت فرض ہو گئی۔

اطاعت ظاہری و باطنی

اطاعت ظاہری مرتبہ نبوت سے تعلق رکھتی ہے۔ اور اطاعت باطنی مرتبہ ولایت سے۔ صوفیہ کرام کی اصطلاح میں مرتبہ نبوت یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے احکام خداوندی حاصل کر کے خلق کو خدا تک پہنچاتے تھے اور مرتبہ ولایت یہ ہے کہ مقام لی مع اللّٰہ وقتٌ میں جبرائیل علیہ السلام کی وساطت کے بغیر آنحضرت براہ راست حضرت حق سبحانہٗ تعالیٰ سے اخذ فیض کرتے تھے۔ اَلْوِلَایَۃُ اَفْضَلُ مِنَ النُّبُوَّۃِ (ولایت نبوت سے افضل ہے)[1]

---

[1] اس کے یہ معنی نہیں کہ ولی نبی سے افضل ہوتا ہے کیونکہ ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ نبوت ایک سرکاری عہدے کا نام اور ولایت ذات حق سے ذاتی تعلق کو کہتے ہیں۔ جیسے گورنر بادشاہ کا نائب ہے۔ لیکن جو تعلق بادشاہ کے ایک دلی دوست کا اس کے ساتھ ہے۔ گورنر کا نہیں ہے۔ یاد رہے کہ کوئی گورنر بادشاہ کا دلی دوست بھی ہو اور گورنر بھی۔

طالبانِ حق نے طعام اور خواب کو اپنے اوپر حرام کئے رکھا ہے تب جاکر ان کو درجۂ قرب نصیب ہوا ہے"۔ اور حضرت فریدالدین "راحت القلوب" میں فرماتے ہیں۔

"اے نظام الدین! درویش کو چاہیے کہ پہلے اپنی آنکھ کو لوگوں کے عیوب دیکھنے سے اندھا بنالے، دوسرے کان کو لوگوں کے عیوب کے متعلق کچھ سننے سے بہرا بنالے، تیسرے زبان کو کچھ کہنے سے گنگ بنالے، چوتھے اپنے پاؤں کو لنگڑا بنالے یعنی نہ جانے والی جگہوں پر جہاں کے لئے نفس تقاضا کرے نہ جائے اور ہواس کی مخالفت کرے کیونکہ:۔ النفس خاصیتہٗ مالعتہٗ وافضل الاعمال خلافہا۔

حتی کہ درگاہِ حق تعالیٰ کا محبوب و مقبول بن جائے۔

نیز کیمیائے سعادت میں آیا ہے کہ سالک کو چاہیئے کہ چار چیزوں سے اپنا حصار بنالے اول تنہائی، دوسرے کم بولنا کیونکہ بہت باتیں کرنے سے سالک کا دل تاریک ہو جاتا ہے، تیسرے کم کھانا کیونکہ کم کھانے سے شیطانی راستے بند ہو جاتے ہیں، چوتھے تھوڑا سونا کیونکہ بہت سونے سے غفلت پیدا ہوتی ہے، ابدال لوگ جو درجہ ابدالیت کو پہنچے ہیں انہی چار چیزوں کی مداومت سے پہنچے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء

ایک روز میں (مؤلف ملفوظات) حضرت قبلہ کی خدمت میں بیٹھا تھا۔ ایک ہندو نے آکر حضرت قبلہؒ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کی زیارت کا مجھے بہت ہی شوق تھا۔ حضرت قبلہ قدس سرہٗ نے فرمایا کہ ہمارے طریقہ میں یہ بات داخل ہے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے ساتھ صلح رکھی جائے اور یہ بیت، بطور شہادت، کے پڑھا ے

حافظا گر وصل خواہی صلح کن با خاص و عام
با مسلماں اللہ اللہ با برہمن رام رام!

اس باب میں متفق الرائے ہیں۔ انسان خدا کا ایک بیج ہے۔ جس کے نخل و شجر ہمارے اخلاق حسنہ اور حسناتِ رُوحانی ہیں۔ اور رُوحانیت کے درجۂ تکمیل کو پہنچ کر انسان مملکت ربی کے شہری بننے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ لیکن ہدایتِ ربی کے بغیر یہ بات ناممکن ہے۔ منزل مقصود کا سیدھا راستہ مذہب حقہ ہی دکھاتا ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ ہماری راہنمائی خود اپنے ذمّہ لیتا ہے۔ جیسے کہ مصحف پاک میں بیان ہے۔ وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر ولو شاء لھدٰکم اجمعین۔ اور اللہ پر ہی سیدھی راہ پر چلانا ہے۔ بعض راہیں ٹیڑھی ہیں۔ اور اگر وہ چاہتا۔ تو تم سب کو ہدایت کرتا (۹-۱۶) وعلٰمٰت وبالنجم ھم یھتدون۔ اور بڑے بڑے نشان (بنا دیئے ہیں) اور ستاروں کے ذریعہ کہ وہ رستہ معلوم کر لیتے ہیں + (۱۶-۱۶)

خدا تعالیٰ نے بہت سے نشان اور ستارے پیدا کئے۔ کہ وہ دنیاوی مسافرت میں ہماری راہنمائی کریں۔ اور درست راستے کی تلاش میں ہم بھٹکتے نہ پھریں۔ اُسی طرح سلک اخلاق و روحانیات کو بھی ایسے نشانوں سے مزین کر دیا۔ کہ انسان کہیں راہ میں سرگرداں نہ ہو۔ اور ہر قدم اُسے منزل مقصود کے قریب تر لیجائے۔ اپنے پیغمبروں کی وساطت سے اس نے بارہا اپنے پیغامات بھیجے۔ لیکن ہماری خوش بختی سے پہلے پیغامات انسان کی دستبرد کے سبب ضائع یا مسخ ہو گئے ہیں۔ قرآن پاک اس کا آخری پیغام ہے۔ اور دوست دشمن سب اس باب میں متفق الرائے ہیں کہ وہ اپنی اصلی حالت میں ہم تک پہنچا ہے۔

میں مانتا ہوں۔ کہ ہر ایک مذہب انسان کی مساعی کے لئے ایک ہی منزل مقصود تجویز کرتا ہے۔ مگر ان راہوں میں جو اس منزل تک پہنچتی ہیں۔ سب کا اختلاف ہے مگر خواہشات نفسانی کی قربانی کے اصُول کے سب موافق ہیں۔ چنانچہ یہ سب کا ایمان ہے کہ جب تک اخلاق و روحانیت کے نخل کی آبیاری نفسانیت کے خون سے نہ کی جاوے۔ وہ کبھی مثمر ثابت نہ ہوگا +

(الشيخ النجيب السهروردي رضي الله عنه)

أخبرنا الفقيه أبو علي إسحاق بن علي بن عبد الله بن عبد الدائم بن صالح الهمداني الصوفي الشافعي، المحدث بالقاهرة سنة إحدى وسبعين وستمائة.

قال: أخبرنا الشيخ الجليل الأصل أبو محمد عبد اللطيف ابن الشيخ أبي النجيب عبد القاهر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله السهروردي، ثم البغدادي الفقيه الشافعي الصوفي بأربل سنة ثمان وستمائة، **قال:** حضر أبي أبو النجيب ببغداد بمجلس الشيخ عبد القادر رضي الله عنه، فقال الشيخ عبد القادر قدمي هذه على رقبة كل ولي لله، فطأطأ أبي رأسه حتى كادت تبلغ الأرض، وقال على رأسي على رأسي على رأسي، يقولها ثلاثًا.

(الشيخ موسى الزولي رضي الله عنه)

أخبرنا الفقيه أبو علي الحسن بن نجم الدين بن عيسى بن محمد الحوراني الحنبلي بالقاهرة سنة ثلاث وستين وستمائة، قال: أخبرنا الشيخ أبو الفتوح يحيى ابن الشيخ أبي السعادات سعد الله بن أبي عبد الله الحسن بن محمد التكريتي بها، قال: دخلتها وافدًا سنة سبع عشرة وستمائة، قال: كنت أرحل من تكريت مع والدي أبي السعادات مرة ببغداد لزيارة الشيخ عبد القادر رضي الله عنه، ومرة إلى ماردين لزيارة الشيخ موسى الزولي رضي الله عنه فأتينا بغداد مرة مع الشيخ موسى الزولي رضي الله عنه حاجين، فحضر مجلس الشيخ عبد القادر، وحضرنا معه فقال الشيخ عبد القادر رضي الله عنه: قدمي هذه على رقبة كل ولي لله، فحنى الشيخ عنقه.

(الشيخ محمد بن موسى بن عبد الله البصري رضي الله عنه)

أخبرنا الشيخ أبو المحاسن يوسف بن أبي المعالي أحمد بن شبيب بن حسين المصري البصري المالكي بالقاهرة سنة تسع وستين وستمائة.

قال: أخبرنا الشيخ الفقيه المقري العدل أبو طالب عبد الرحمن بن أبي الفتح محمد بن أبي المظفر عبد السميع بن عبد الله القرشي الهاشمي الواسطي بها سنة عشرين وستمائة.

قال: حضرت بالبصرة وأنا صبي مع والدي أبي الفتح عند الشيخ القدوة أبي محمد بن عبد الله البصري ﷺ، وكان يتكلم على أصحابه فقطع كلامه وسها ساعة وسكت كل من كان حاضراً إجلالاً له، ثم وضع رأسه على الأرض، وقال: على رأسي، فلما دخل داره دخل أبي معه وأنا خلفهما فقال له أبي وكان يدل عليه: يا سيدي بحق العزيز إلا ما أخبرتني بسبب هذا الفعل والقول اللذين رأيناهما منك فقال: قد قال الشيخ عبد القادر اليوم ببغداد: قدمي هذه على رقبة كل ولي لله، ولم يبق ولي في الأرض حتى فعل مثل ما رأيتني فعلت، **قال:** فأرخ أبي ذلك اليوم وسافر إلى بغداد وأنا معه، فأخبرنا أن الشيخ عبد القادر قد قال ذلك في اليوم الذي أرخه أبي بالبصرة.

(الشيخ حياة بن قيس ﷺ وعنا به)

أخبرنا الفقيه الأجل أبو المكارم خليفة بن محمد بن علي بن أحمد الحراني بن محمد، ثم البغدادي الحنبلي بالقاهرة سنة إحدى وسبعين وستمائة.

قال: أخبرنا الشيخ أبو طالب عبد اللطيف ابن الشيخ أبي الفرج محمد ابن الشيخ أبي الحسن بن علي بن حمزة بن فارس بن محمد الحراني الأصل البغدادي الدار التاجر المعروف بابن القبطي ببغداد سنة إحدى وثلاثين وستمائة.

قال: أخبرنا والدي أبو الفرج محمد، وكان يجلس إلى الشيخ حياة بن قيس الحراني ﷺ، **قال:** حضرت عنده يوماً بحران فمد عنقه وقال: على رقبتي؛ فسأله والدي والشيخ أبو حفص عمر ولده عن ذلك، فقال: يا بني إنه قد قال أستاذنا الشيخ عبد القادر الآن ببغداد: قدمي هذه على رقبة كل ولي لله.

قال: وأتاه مرة أخرى ثلاثة عشر رجلاً من النصارى أسلموا على يديه في مجلس وعظه، ثم قالوا: نحن من نصارى المغرب، وأردنا الإسلام، وترددنا فيمن نقصده لنسلم على يده، فهتف بنا هاتف نسمع صوته، ولا نرى شخصه، يقول: أيها الركب ذوو الفلاح ائتوا إلى بغداد، وأسلموا على يد الشيخ عبد القادر، فإنه يوضع في قلوبكم من الإيمان عنده ببركته ما لم يوضع فيها عند غيره من سائر الناس.

أخبرنا الشيخ الصالح أبو عبد الله محمد بن كامل بن أبي المعالي بن محمد الحسيني البيساني، قال: سمعت الشيخ العارف أبا محمد مفرجة بن نبهان بن ركاف الشيباني، يقول: لما اشتهر أمر الشيخ محيي الدين عبد القادر ﷺ، اجتمع مائة فقيه من أعيان بغداد وأذكيائهم على أن يسأله كل واحد منهم مسألة في فن من العلوم غير مسألة صاحبه ليقطعوه بها، وأتوا مجلس وعظه، وكنت يوم إذن فيه، فلما استقر بهم المجلس أطرق الشيخ وظهرت من صدره بارقة من نور لا يراها إلا من شاء الله تعالى، ومرت على صدور المائة، ولم تمر على أحد منهم إلا ويبهت ويضطرب، ثم صاحوا صيحة واحدة، ومزقوا ثيابهم، وكشفوا رؤوسهم، وصعدوا إليه فوق الكرسي، ووضعوا رؤوسهم على رجليه، وضج أهل المجلس ضجة واحدة ظننت أن بغداد رجت بها، فجعل الشيخ يضم إلى صدره واحدًا منهم بعد واحد حتى أتى على آخرهم، ثم قال لأحدهم: أما أنت فمسألتك كذا وجوابها كذا، حتى ذكر لكلٍ منهم مسألته وجوابها، **قال:** فلما انقضى المجلس أتيتهم وقلت لهم: ما شأنكم؟ قالوا: لما جلسنا فقدنا جميع ما نعرفه من العلم حتى كأنه نسخ منا، فلم يمر بنا قط، فلما ضمنا إلى صدره رجع إلى كل منّا ما نزع منه من العلم، ولقد ذكر لنا مسائلنا التي هيأْناها له وذكر فيها أجوبة لا نعرفها.

أخبرنا الشريف أبو عبد الله محمد بن الخضر بن عبد الله الحسيني الموصلي، قال: سمعت الشيخ العارف أبا القاسم محمد بن أحمد بن علي الجهني، يقول: كنت أجلس تحت كرسي الشيخ محيي الدين عبد القادر ﷺ، .كان له نقباء يجلسون على الكرسي على كل مرقاة منهم اثنان، وكان

اس طرح یہ بیعت لی ہے کہ سب سے پہلے کسی ظرف میں پانی منگوا کر حضور اس میں اپنا دست مبارک ڈال کر نکال لیتے تھے۔ اس کے بعد اس عورت کو (جو بیعت ہونا چاہتی تھی) حکم فرماتے کہ اپنا ہاتھ پانی میں ڈالو پس عورت کو اس احتیاط کے ساتھ بیعت فرماتے تھے۔ (از صحیحین) لہذا بیعت طریقت واجب ہے۔ بعض بزرگان دین اس بیعت کو فرض کہتے ہیں۔ اور استدلال میں یہ حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً (ابن ماجہ) (ترجمہ: جو شخص بلا بیعت کئے ہوئے مرا وہ جہالت کی موت مرا) طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَّمُسْلِمَةٍ۔ (صحیح بخاری) (طلب کرنا علم الٰہی کا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اکثر علماء کا اتفاق ہے کہ بیعت طریقت سنت مؤکدہ ہے۔ مگر خدا کے چاہنے والوں کے لئے فرض ہے۔ بیعت توبہ جب کوئی اپنے صغیرہ، کبیرہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ اس سے بیعت استغفار لی جاتی ہے اور یہ مستحب ہے۔

آداب شیخ

(۱) جب مرید اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہو تو۔ ہر وقت شیخ کے جمال پر نظر رکھے۔ اور عاشق کی طرح اس کا منہ تکتا رہے۔ یا اگر کھڑا ہے تو اپنے پیروں پر نظر رکھے۔ اور جب تک شیخ حکم نہ دے کھڑا رہے۔ جب حکم ملے تو بیٹھے۔ اگر بیٹھے تو اپنے سینے پر نظر رکھے۔ (۲) شیخ کے سامنے اور کسی سے بات چیت نہ کرے۔ شیخ کے روبرو دوڑ کر نہ چلے۔ (۳) جب شیخ کے سامنے حاضر ہو تو اپنا سر سر زمین پر رکھے۔ کیونکہ تمام خواجگان کا یہی دستور تھا۔ اور اب تک سلسلہ میں جاری ہے۔ (۴) اگر مرید کوئی چیز لایا ہے تو سامنے ادب سے رکھ دے۔ اور اگر وہ تبرک شیخ سے لایا ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھ کر شیخ کے روبرو نہایت ادب سے پیش کرے۔ (۵) مرید کو چاہئے کہ شیخ کے ہمیشہ اور اس کی ظاہری [illegible] کی طرف متوجہ [illegible] بلکہ اس [illegible] اور فیضان کو مد نظر رکھے [illegible] اور وجاہت کچھ نہ ہو

وجہ سے کبھی کبھی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اس پر خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے حکایت بیان فرمائی کہ لاہور میں ایک واعظ تھے جو وعظ اچھا کہتے۔ ان کی بات میں تاثیر تھی خلوق کو ان کے بیان میں رقت و راحت حاصل ہوتی تھی۔ پھر وہ حج کو گئے جب واپس آئے تو ان کے کلام میں وہ ذوق و راحت باقی نہ رہے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کی گفتگو میں پہلے جیسی چاشنی نہیں رہی۔ بولے کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ کس نحوست کی وجہ سے (چاشنی نہیں رہی) اس وجہ سے کہ اس سفر کے دوران راستے میں میری دو نمازیں وقت پر نہ ہوئی تھیں۔

چھیاسٹھویں مجلس

اسی سال ماہ جمادالاٰخر کی پانچویں تاریخ منگل کو ہاتھ چومنے کی دولت تک رسائی ہوئی۔ پیری مریدی کے آداب کا ذکر آیا۔ اور اس بات کا بھی کہ پیر کو مرید سے کسی قسم کا لالچ نہیں کرنا چاہئے۔ اس وقت حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ کسی مرید نے اپنے پیر کی خدمت میں چند خربوزے لا کر پیش کئے۔ پیر نے نہیں لئے اور اس کو واپس کر دیئے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ پیر مرید کا نذرانہ کیوں رد کرے؟ پیر نے جواب دیا کہ جس طرح دین کے کام میں پیر کو مرید کا کسی طرح محتاج نہیں ہونا چاہئے۔ اسی طرح دنیا کے کام میں بھی مرید کا محتاج نہیں ہونا چاہئے۔

پھر اس بات کا ذکر نکلا کہ مخدوم کی خدمت میں مرید آتے ہیں اور سجدہ تعظیم کرتے ہیں۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ میرا جی تو چاہتا ہے کہ لوگوں کو منع کروں لیکن چونکہ میرے شیخ کے سامنے بھی اسی طرح ہوتا تھا۔ اس لئے منع نہیں کرتا۔ خادم نے اس پر عرض کیا کہ جو غلام مخدوم سے وابستہ ہیں اور جو مرید ہوئے ہیں اور بیعت کی ہے ان کی یہ ارادت اور بیعت پیر کے عشق و محبت سے عبارت ہے۔ پس جہاں عشق و محبت کا دخل ہوتا ہے۔ وہاں زمین پر سر رکھنا ایک معمولی سی خدمت ہے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے اس بات کی موافقت میں فرمایا کہ میں نے شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز سے سنا ہے کہ ایک دفعہ شیخ ابو سعید ابوالخیر رحمتہ اللہ علیہ کسی راستے میں سوار جارہے تھے کہ ایک مرید سامنے آیا اور یہ مرید پیدل تھا اس نے شیخ کے گھٹنے کو چوما۔ شیخ نے فرمایا کہ اور نیچے۔ مرید نے شیخ کے پیر

کو چوما۔ شیخ نے فرمایا اور نیچے۔ مرید نے گھوڑے کے گھٹنے کو بوسہ دیا۔ شیخ نے فرمایا اور نیچے۔ مرید نے گھوڑے کے سم کو بوسہ دیا۔ شیخ نے کہا اور نیچے مرید نے زمین چومی۔ اس وقت شیخ نے ارشاد کیا کہ یہ جو میں تجھ سے کہتا جاتا تھا اور نیچے نیچے تو اس سے میرا مقصد زمین چومنا نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ تو جتنا جھکتا ہے اتنا ہی تیرا درجہ بلند ہوتا جاتا ہے۔

پھر ان درویشوں کی حکایت آئی جن کو شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے خلافت عطا فرمائی تھی۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ ان میں سے ایک درویش تھے جن کو عارف کہتے تھے۔ ان کو سیوستان اور ان حدود کی طرف بھیجا تھا اور بیعت لینے کی اجازت دی تھی اور ایسا ہوا کہ ایک ملک (بادشاہ' حاکم یا نواب) ملتان اور اچہ کی طرف تھا اور یہ عارف اس ملک کے امام تھے۔ یا کسی اور طرح کا تعلق رکھتے تھے الغرض ایک دفعہ اس ملک نے سو ٹنکے (ایک سکہ) ان عارف کے ہاتھ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں بھیجے انہوں نے اس میں سے پچاس ٹنکے اپنے پاس رکھ لئے اور پچاس ٹنکے شیخ کی خدمت میں پیش کئے۔ شیخ مسکرائے اور فرمایا کہ تم نے بھائیوں کی طرح تقسیم کرلیا! یہ عارف شرمندہ ہو گئے۔ فوراً بقیہ پچاس ٹنکے بھی شیخ کی خدمت میں پیش کر دیئے اور بڑی عاجزی کے ساتھ معافی مانگی اور مرید (۳۰) ہونے کی درخواست کی۔ شیخ نے دست مبارک بیعت کے لئے ان کو دیا اور وہ محلوق ہوئے (سر منڈایا) اس کے بعد شیخ کی خدمت میں ایسے پکے ہوئے کہ پوری استقامت حاصل کرلی۔ چنانچہ آخر میں شیخ نے انہیں بیعت کی اجازت عطا فرمائی اور سیوستان کی طرف بھیج دیا۔

ستر ھویں مجلس

اسی سال ماہ رجب کی تیئسویں تاریخ پیر کو دست بوسی کی دولت تک رسائی ہوئی غرور کا تذکرہ آیا۔ اور اہل رعونت اور ان لوگوں کا جو اپنے کو کچھ سمجھتے ہیں ارشاد ہوا کہ حضرت عائشہ ؓ سے پوچھا گیا کہ آدمی برا کب ہوتا ہے فرمایا گیا کہ اس وقت جب وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے۔

اس بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ فرزدق (۳۱) نامی ایک شاعر تھے۔ ایک دفعہ وہ اور